পদার্থবিদ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান প্রবেশ

তাপ ● আলো

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে]

HEAT ● LIGHT
by Charu Chandra Bhattacharya

প্রথম পর্ষদ সংস্করণ
প্রকাশকাল—মে ১৯৮০

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আর্য ম্যানসন (নবমতল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

চিত্রাংকন : এস্ মিত্র
প্রচ্ছদ : বিমল দাস

মুদ্রক :
শ্রীপ্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়
টাইপোগ্রাফার্স অফ ইণ্ডিয়া
৩৬ এ, কে. জি. বোস সরণী
কলিকাতা—৭০০০১০

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the Universtiy level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

পর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য লোকরঞ্জন বিজ্ঞান-পুস্তিকামালার অন্তর্গত সুখপাঠ্য নিবন্ধিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পুনর্মুদ্রণে অগ্রণী হয়েছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেসব দুষ্প্রাপ্য অথচ ছাত্র ও শিক্ষার্থীর উপযোগী পুস্তকাদি রয়েছে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ-প্রকল্পের অন্তর্গত এই কার্যসূচী। প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন মিত্রের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলেই এই কার্যসূচীর বাস্তবায়ণ সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃপক্ষ পর্ষদকে প্রকাশনার অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সকল পড়ুয়া শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন আমাদের এই মুদ্রণপ্রয়াস যদি পাঠক-সমাজের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হয়, তবেই এজাতীয় ভবিষ্যত কর্মোদ্যোগে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ উৎসাহ বোধ করবেন। আশা রাখি সুধী পাঠক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এই গ্রন্থমালার পুনঃ প্রকাশনা উদ্যমকে স্বাগত জানাবেন।

কলিকাতা
মে, ১৯৮০

দিব্যেন্দু হোতা
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

পরিষদের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল ভারতীয়-দের হাতে। সারা বিশ্বে ঘোষিত হল ভারতের স্বাধীনতার কথা। ভারতের মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল কর্মের উন্মাদনা। এই উন্মাদনাকে সঠিকপথে চালিত করতে হলে, ভারতের সীমিত সম্পদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা। আবার পরিকল্পনাগুলিকে যথোচিত বাস্তবায়িত করতে হলে চাই গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা বিজ্ঞান সচেতনতাই মানুষকে করে তোলে যুক্তিবাদী, অন্ধসংস্কার বিরোধী। সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে শুধু এই কথাগুলি অনুধাবন করেননি, তাঁর দূরদৃষ্টি চিন্তাধারাকে রূপায়িত করার জন্যে তরুণ ও প্রবীন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানীনুরাগীদের নিয়ে স্থাপিত করেন **বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ** ১৯৪৮ সালে। এই বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সহজ সরলভাবে বিজ্ঞানের কথাগুলিকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানালেন মাতৃভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করতে। তাঁর আহ্বানের ফসল এই পুস্তিকা। আচার্য বসু তাঁর জীবিতকালে পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই পুস্তকটি প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় ও অর্থাভাবে বহুদিন পরিষদের জনপ্রিয় পুস্তকগুলি অপ্রকা-শিত থাকে। এই সংকটকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করছে বলে আমরা মনে করি। আশা করব পরিষদ ও পর্ষদের উদ্দেশ্য পুস্তকগুলি বহুল প্রচারের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

ডঃ রতনমোহন খাঁ
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

অধ্যায়সূচী

তাপ

আলো

চিত্রসূচী

তাপ

আলো

হাফটোন চিত্র

তাপ

তাপ

তাপবোধ

17 জ্যৈষ্ঠ। দুই বন্ধুর মধ্যে তর্ক উঠল। রাম বললে – কাল বেশি গরম ছিল। শ্যাম বললে—না, আজ বেশি গরম। তাদের এ তর্কের মীমাংসা হবে কি করে? তাদের কথা দিয়ে যে মীমাংসা হতে পারে না তার কারণ এই ঃ

আমাদের দেহ দিয়ে তো আমরা ঠাণ্ডা গরম অনুভব করি, কিন্তু আমাদের এ অনুভূতি মাঝে মাঝে আমাদের ঠকায়ও। তাছাড়া এ বোধ সকল মানুষের সমান নয়, আর দেহের আগেকার অবস্থার উপর তার এ বোধ অনেকটা নির্ভর করে। আগের অবস্থার উপর কি রকম নির্ভর করে সে সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলছি। দার্জিলিং থেকে একখানা ট্রেন নেমে এসে কার্সিয়ং-এ থামল, আর ঠিক সেই সময় শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার একখানা ট্রেন এসে ওখানে দাঁড়াল। দেখা গেল, দার্জিলিং থেকে যে যাত্রী নামছে সে জায়গাটা খুব গরম বোধ করে গায়ের গরম কাপড় খুলে ফেলছে, আর ঠিক একই জায়গায় একই সময় শিলিগুড়ি থেকে যে লোক উঠছে সে জায়গাটা খুব ঠাণ্ডা বোধ করে গরম কাপড় জড়াচ্ছে।

রাম-শ্যামের দ্বন্দ্ব মিটল তার পরদিন। কাগজে দেখল, 16 জ্যৈষ্ঠ উষ্ণতা ছিল 102° ডিগ্রী, আর 17 জ্যৈষ্ঠ 103° ডিগ্রী। বাস্, রামের আর কথাটি বলার জো রইল না। কিন্তু 102° ডিগ্রী 103° ডিগ্রী এসব কথার মানে কি হল! বলছি পরে।

তাপের ধর্ম

তাপের অনেকগুলি ধর্ম আছে। একটা ধর্ম হল এই ঃ

কোন পদার্থ উত্তপ্ত হলে তার আয়তন বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধি কঠিন

পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থে বেশি, গ্যাসীয় পদার্থে আরও বেশি। আর সব জিনিসের বৃদ্ধির পরিমাণ এক নয়। আবার গরম যত বাড়ে, বৃদ্ধির পরিমাণ তত বেশি হয়।

আমাদের আশেপাশে অনেক ব্যাপারে আমরা তাপের এই কাজ লক্ষ্য করি। গোরুর গাড়ির চাকায় যখন লোহার বেড় পরায় তখন লোহাটাকে আগে বেশ গরম করে নেয়, এতে ফাঁদটা একটু বেড়ে যায়। এখন এটাকে চাকার উপর বসায়, তারপর লোহাটা ঠাণ্ডা হলে বেড়টার আয়তন কমতে থাকে এবং চাকার উপর বেশ চেপে বসে। রেল-লাইন যখন পাতে, তখন পরপর দুখানি রেলের মধ্যে কিছু ফাঁক রেখে দেয়। এ রকম যদি না করত, গায়ে গায়ে যদি ঠেকিয়ে রেখে দিত, তাহলে ট্রেন চলবার সময় চাকার ঘসানিতে লোহার লাইন গরম হয়ে লম্বায় বাড়ত, ফলে লাইন বেঁকে যেত, লাইন থেকে ট্রেনের পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকত। কাচের গেলাসে ফুটন্ত জল ঢাললে গেলাসটা অনেক সময় চিড় খায়। তার কারণ এই: তাপে গেলাসের ভিতরটা বাড়ে, কিন্তু কাচের মধ্যে দিয়ে তাপ সহজে যায় না বলে বাইরের দিকটা প্রায় ঠিক থাকে। একদিকে বাড়ল আর একদিকে বাড়ল না, এর ফলে গেলাসটা চিড় খায়। গরম জল না দিয়ে বরফ দিলেও একই ব্যাপার ঘটবে। তবে মোটা গেলাসে এই রকম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পাতলা গেলাসে গরম জল দিলে তাপের অনেকটা বাইরে গিয়ে পৌছয়, সে দিকটাও বাড়ে, দুদিক সমান বাড়বার ফলে কাচ আর ফাটে না।

থার্মমিটার

তাপে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়, তাপের এই ধর্ম কাজে লাগিয়ে উষ্ণতা মাপবার যন্ত্র তৈরি হল। এই যন্ত্র হল থার্মমিটার। মনে করা যাক, কয়েকটি পাত্রে জল আছে, কিন্তু জলের উষ্ণতা সব পাত্রে সমান নয়। একটা লোহার ডাণ্ডা নিলুম, আর সেই ডাণ্ডাটা একটা পাত্রের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে তার দৈর্ঘ্য মাপলুম। দৈর্ঘ্যটা টুকে রাখলুম। এখন তুলে নিয়ে ডাণ্ডাটা আর এক পাত্রের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে আবার ওর দৈর্ঘ্য মাপলুম। এখন যদি দেখা যায় ওর দৈর্ঘ্য বেড়ে গিয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে দ্বিতীয় পাত্রের জল অপেক্ষাকৃত বেশি গরম।

তবে তো লোহার ডাণ্ডাটা আমাদের থার্মমিটার হতে পারে। কিন্তু সে কি! থার্মমিটার বলতে তো আমরা পারা-ভরা কাচের নল বুঝি। সে কথায় আসা যাচ্ছে। ডাণ্ডাটা থার্মমিটার হতে পারত, কিন্তু গরমে ঠাণ্ডায় ওর বাড়া-কমাটা এত অল্প যে সহজে সেটা মাপা যায় না। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। আগে তো দেখা গিয়েছে কঠিন পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি, আর গ্যাসীয় পদার্থে আরও বেশি। বেশ, ওই লোহার ডাণ্ডা না দিয়ে যদি কিছুটা গ্যাসীয় পদার্থ নেওয়া যায়, যেমন বায়ু, তবে হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক বেশি হবে, সহজে মাপা যাবে। কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করার অসুবিধা আছে। সুতরাং মন্দের ভাল, একটা তরল পদার্থ দেওয়া যাক। নেওয়া হল পারা। কিন্তু পারা কেন, জল নিলে ক্ষতি কি, আর জল নিলে তো কোন খরচ নেই! কিন্তু পারা নেওয়ায় অনেক সুবিধা আছে। প্রধান সুবিধা এই, যে-ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয় সে-ঠাণ্ডায় তো নয়-ই, আরও বেশি ঠাণ্ডায়ও পারা তরল অবস্থাতেই থাকে, জমে না। আবার যে-গরমে জল ফুটতে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি গরমেও পারা ফোটে না, ওই তরলই থেকে যায়।

সুতরাং একটা থার্মমিটার এইভাবে তৈরি হল। একটা সরু বিঁধের কাচের নল নেওয়া হল। কাচের নল নিতে হবে বৈ কি, কারণ, ভিতরের পারার উঠা-নামা তো দেখতে হবে। এই নলের একদিকে একটা বড় খোল করা হয়েছে, সমস্তটা একটা হুঁকার মতো দেখতে হয়েছে আর কি। খোলটা বড় হওয়ায় ওর মধ্যে বেশি পারা ধরবে, সুতরাং তাপে পারার বৃদ্ধির পরিমাণও বেশি হবে, আর সেটা সরু নলে যাওয়া আসা করায় অনেকটা দূর দূর উঠা-নামা করবে। অত সরু নলে পারা ভরা একটা কঠিন ব্যাপার। যা হোক, সেটা করে ভিতরের বায়ু তাড়িয়ে মুখটা বন্ধ করা হল। থার্মমিটার তৈরি হল, কিন্তু আর একটু কাজ বাকি আছে। পারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা জানতে হলে নলের গায়ে দাগ কেটে কেটে সংখ্যা বসিয়ে যেতে হবে। এই সংখ্যা রাম এক রকম বসাল, শ্যাম আর এক রকম বসাল, এ রকম করলে তো চলবে না। এটা ঠিক করে নেওয়া হল।

প্রথমে থার্মমিটারকে পরিষ্কার বরফের গুঁড়ার মধ্যে রাখা হল। দেখা যাবে, নলের মধ্যে পারা ধীরে ধীরে নেমে এসে এক জায়গায় দাড়িয়েছে, আর নামে না। এই জায়গাটায় একটা চিহ্ন দেওয়া হল। একে বলা হয় দ্রবণাঙ্ক। এইবার নলটাকে ফুটন্ত জল থেকে যে স্টীম বেরচ্ছে, তার মধ্যে রাখা হল। নলের মধ্যে পারা উঠতে থাকল, শেষ অবধি এক স্থানে এসে দাড়াল, আর ওঠে না। এইটে হল পারার স্ফুটনাঙ্ক। এই দু জায়গায় দুটো দাগ কেটে মাঝের জায়গাটা কতগুলি সমান সমান ঘরে ভাগ করা হল।

কিন্তু কত ভাগে ভাগ করা হবে, তা নিয়ে একমত রইল না। বিজ্ঞানের কাজকর্মে যে থার্মমিটার ব্যবহার করা হয়, তার দ্রবণাঙ্ক ধরা হয় 0° ডিগ্রী, আর স্ফুটনাঙ্ক 100° ডিগ্রী, মাঝের জায়গাটা 100 সমান ভাগে ভাগ করা হয়। এই যে স্কেল হল তাকে বলা হয় সেন্টিগ্রেড স্কেল। কিন্তু সাধারণ কাজকর্মে, যেমন বায়ুর উষ্ণতা কত হল, দেহের তাপ কত, এ সব জানতে হলে অন্য এক রকমের স্কেল ব্যবহার করা হয়। সেই স্কেলকে বলা হয় ফ্যারেনহিট স্কেল। ফ্যারেনহিট স্কেলের দ্রবণাঙ্ক ধরা হয় 32° ডিগ্রী, আর স্ফুটনাঙ্ক 212° ডিগ্রী, মাঝের জায়গাটা 180° ঘরে ভাগ করা হয়।

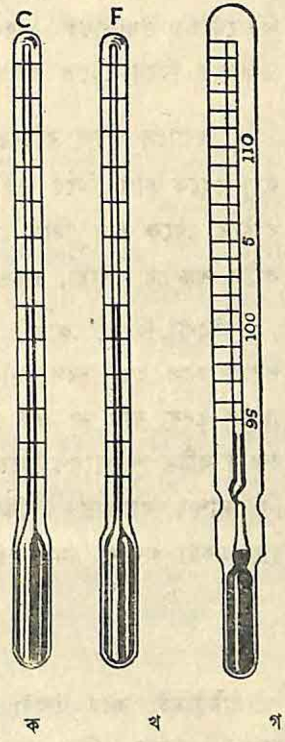
একটা পাত্রে গরম জল আছে, তার উষ্ণতা আমরা মাপতে চাই। সে জলের মধ্যে থার্মমিটার দেওয়া হল, থার্মমিটারে পারা উঠল, পারা যে দাগে গিয়ে দাঁড়াল আমরা দেখলুম। কিন্তু থার্মমিটারকে জলের মধ্যে রেখেই সেই অবস্থায় দাগের সংখ্যা পড়তে হবে, তবেই জলের উষ্ণতা ঠিক জানা যাবে। বাইরে এনে পড়লে বাইরের উষ্ণতাই পাওয়া যাবে, জলের উষ্ণতা জানা যাবে না।

দেহের তাপ মাপবার থার্মমিটার

আচ্ছা, আমার জর হয়েছে কিনা জানতে চাই। দেহে থার্মমিটার চেপে দিলুম, কিন্তু দেহের মধ্যে থাকা কালীন তো ওই থার্মমিটার পড়ি না, বাইরে এনে পড়ি। তবে তো সব ভুল হয়ে যায়, দেহের উষ্ণতা না পেয়ে আমরা বাইরের বায়ুর উষ্ণতা পাই। ঠিক কথা, একটা সাধারণ

থার্মমিটার ব্যবহার করলে এই রকমই হত। কিন্তু দেহের উষ্ণতা দেখবার জন্য আমরা যে থার্মমিটার ব্যবহার করি, তার একটা বিশেষত্ব আছে, আর সেই বিশেষত্ব থাকার জন্য বাইরে এনে পড়লেও কোন ভুল হয় না।

যে থার্মমিটার দিয়ে দেহের উষ্ণতা মাপা হয়, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার খোলটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার একটু পরে নলের গোড়ার দিকে, এক জায়গায় নলটা খুব বেশি রকম সরু হয়ে গিয়েছে। পারা গরম হয়ে যখন বাড়ে, তখন ওই সরু জায়গার মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু তাপ কমবার সময় যখন তা কমে ঘন হয় তখন ওই বাধার মধ্যে দিয়ে ফিরতে পারে না, নলের মধ্যে পারা যতদূর অবধি গিয়েছিল প্রায় ততদূর অবধি থেকে যায়। সেই জন্যে এ থার্মমিটার বাইরে এনে পড়লেও বিশেষ কিছু ভুল হয় না। পারা নলের মধ্যে প্রায় একই জায়গায় থাকে বটে, কিন্তু খোলের মধ্যের পারা আয়তনে একটু কমে, মাঝে একটু ফাঁক থেকে যায়। পরে ওই থার্মমিটার আবার ব্যবহার করতে হলে নলের পারাকে ঝাঁকানি দিয়ে ওই খোলের পারার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়।



চিত্র—1

ক = সেন্টিগ্রেড থার্মমিটার
খ = ফ্যারেনহিট থার্মমিটার
গ = দেহের উষ্ণতা মাপবা থার্মমিটার

আমার দেহে থার্মমিটার দিয়ে দেখলুম পারা 100° ডিগ্রীতে উঠেছে। এটা 100° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, না ফ্যারেনহিট ? সর্বনাশ, 100° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হলে তো দেহের জল টগ্‌বগ করে ফুটতে থাকত। সেন্টিগ্রেড হতেই পারে না, ওটা 100° ডিগ্রী ফ্যারেনহিট। খবরের কাগজে বায়ুর যে উষ্ণতা দেওয়া হয়, তাও ফ্যারেনহিট স্কেলে প্রকাশ করা হয়।

তাপে পদার্থের অবস্থা-পরিবর্তন

পদার্থকে তো আমরা তিন অবস্থাতেই পাই,—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। তাপ বাড়িয়ে আমরা একটা পদার্থকে কঠিন থেকে তরল অবস্থায় বা তরল থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি। কোন পদার্থে অল্প উষ্ণতায়ই এ-রকম ঘটে, আবার কোথাও বা পদার্থকে বেশি উষ্ণতায় নিয়ে যেতে হয়।

গেলাসে বরফ রয়েছে, আলাদা করে তাপ না দিলেও বাইরের বায়ু থেকে তাপ নিয়ে ওই বরফ গলে জলের আকার নিচ্ছে। আবার বাইরে থেকে তাপ দিয়ে যেতে থাকলে জল অদৃশ্য স্টিমের রূপ নেবে। কঠিন শক্ত যে লোহা, প্রচণ্ড উষ্ণতায় তাও তরল হয়।

উল্টো দিকে, কোন রকমে তাপ বের করে নিতে পারলে গ্যাসীয় পদার্থ তরল হয়, তরল পদার্থ কঠিন হয়ে যায়। শুনে অবাক হতে হয়, চোখে দেখা যায় না এই যে বায়ু, বিজ্ঞানী তাকে তরল করেছে, শেষ অবধি কঠিন আকারেও নিয়ে গিয়েছে। টলটলে তরল বায়ু, শক্ত বায়ু, কি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু এর পর তো আর সন্দেহ রইলনা যে, বায়ু একটা পদার্থ, আর তারও ওজন আছে।

তাপের মাপ

মিটমিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছে, আলোর সঙ্গে সঙ্গে কিছু তাপও বেরচ্ছে, কিন্তু তাপের পরিমাণ খুবই কম। একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে, তার থেকে আর একটু বেশি তাপ পাওয়া যাচ্ছে। একটা জ্বলন্ত উনান আরও বেশি তাপ দিচ্ছে। কিন্তু অল্প তাপ দিচ্ছে, কি বেশি তাপ দিচ্ছে এসব কথার পরিষ্কার মানে থাকে, যদি তাপেব পরিমাণ মাপবার ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান তা করল। মাপার কাজে সব আগে দরকার হয় একটা মাপকাঠি করা। তা ঠিক হল। এক গ্র্যাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তুলতে যে-পরিমাণ তাপের দরকার, তাকে একক ধরা হল, আর সেই একককে বলা হল ক্যালরি। এখন এই ক্যালরির হিসেবে তাপের মাপজোক চলল।

বরফ আছে 0° ডিগ্রীতে, গলে জল হয় 0° ডিগ্রীতে, কিন্তু গলতে তাপ লাগছে। দেখা গেল, এক গ্র্যাম বরফকে শুধু গলাতে তাপ লাগে প্রায় 80 ক্যালরি। সেই রকম এক গ্র্যাম 100° ডিগ্রীর জলকে স্টিমে নিয়ে যেতে প্রায় 540 ক্যালরি তাপ লাগে। দু জায়গাতেই যে তাপ লাগছে, তা পদার্থের উষ্ণতা বাড়াচ্ছে না, একই উষ্ণতায় শুধু তাকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে যেতে ওই তাপ লেগেছে। এরূপ নানা দিকে তাপের পরিমাণের হিসেব চলল।

আমাদের এই দেহ সদাই উত্তপ্ত। দেহ থেকে তাপ কিন্তু সর্বদা বেরিয়ে যাচ্ছে। তা পুরিয়ে রাখতে হবে। কি করে? উপযুক্ত খাবার খেলে তার জন্যে দেহের ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়া হবে, তার ফলে তাপ জন্মাবে। কতটা তাপ দরকার, আর কোন খাবার কতটা করে খেলে অন্যান্য চাহিদা মিটবে, অথচ দরকার মতো তাপও পাওয়া যাবে খাদ্য-বিজ্ঞান তার হিসেব করতে থাকল।

যে পরিমাণ তাপ এক গ্র্যাম জলে দিলে জলের উষ্ণতা বাড়বে এক ডিগ্রী, এক ক্যালরি তাকেই ধরা হয়েছে। কিন্তু সেই এক ক্যালরি তাপ যদি এক গ্র্যাম তামাতে দি, তবে তাপ উঠে যাবে প্রায় দশ ডিগ্রী, এক গ্র্যাম অ্যালুমিনিয়মে উঠবে প্রায় পাঁচ ডিগ্রী, এই রকম। একই ওজনের একখানা লোহার কড়া আর একটা অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি উনানে বসালে অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িটাই শিগ্‌গির তেতে উঠবে।

জল কত ডিগ্রীতে ফুটতে থাকে? কেন, 100° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। এই হিসেবেই তো ওই থার্মমিটার তৈরি হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে একটু কথা আছে।

বায়ুর চাপ ও স্ফুটনাঙ্ক

আমরা জানি, বায়ু প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। এই চাপের পরিমাণ সব সময় ও সব জায়গায় ঠিক থাকে না, কম-বেশি হয়। পর্বতের উপরে বায়ুর চাপ কম। বায়ুর চাপ যদি স্বাভাবিক থাকে, তবে জল 100° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ফোটে। 76 সেন্টিমিটার পারার চাপকে স্বাভাবিক চাপ ধরা হয়। চাপ স্বাভাবিকের কম হলে জল 100° ডিগ্রীর কমে ফুটতে থাকে।

পর্বতের উপর বায়ুর চাপ কম থাকায় সেখানে 100° ডিগ্রীর কমেই জল ফোটে। তাই আমরা দেখি পর্বতের উপরে ডাল, মাংস প্রভৃতি সহজে সিদ্ধ হয় না।

পর্বতের উচ্চতা-নিরূপণ

কত উঁচুতে উঠলে চাপ কতটা কমে, তার একটা হিসেব আছে। আবার চাপ কি রকম কমলে স্ফুটনাঙ্ক কত কমে তারও হিসেব জানা আছে।

একটা পর্বতের উচ্চতা কত আমরা জানতে চাই। সেখানে জল ফোটান হল, কত ডিগ্রীতে জল ফুটল, একটা থার্মমিটার দিয়ে তা লক্ষ্য করলুম। কি রকম বায়ু-চাপ হলে ওই উষ্ণতায় জল ফুটবে হিসেব থেকে তা বেরল। এইবার অন্য হিসেব থেকে পাওয়া গেল কত উচ্চতায় ওই পরিমাণ বায়ু-চাপ হবে। কাজেই পর্বতের উচ্চতা কত তা আমরা জানলুম। স্কেল দিয়ে ফিতে দিয়ে মাপা নয়, শুধু একটা থার্মমিটারের সাহায্যে পর্বতের উচ্চতা বেরল।

বাষ্প

হাঁড়িতে জল নিয়ে ক্রমশ গরম করে গেলে শেষ অবধি জল ফুটতে থাকে, তখন ওই জল স্টিমে পরিণত হয়।

কিন্তু শুধু যে বাইরে থেকে তাপ দিলে জলের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তা নয়। ভিজে কাপড় মেলে দিলে শুকিয়ে যায়, ঘরের মেঝে ধুয়ে দিলে শুকতে দেরি হয় না। ঘরের মধ্যে একখানি থালায় জল রেখে দিলে দেখা যাবে, দু চার দিনের মধ্যে জল অদৃশ্য হয়ে গেল। এসব ক্ষেত্রে জলকে তো ফোটান হচ্ছে না, তবে জল যাচ্ছে কোথায়? আলাদা করে তাপ না দিলেও জল ধীরে ধীরে অদৃশ্য গ্যাসীয় রূপ নিচ্ছে। আমরা বলি, জল বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। স্টিম আর বাষ্প কথা দুটো আমরা আলাদা করে নিলুম। জল ফুটলে যে অদৃশ্য গ্যাসের রূপ নেয় সেটাকে বলি স্টিম, আর যে কোন উষ্ণতায় জল যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য রূপ নিচ্ছে সেটাকে বলি বাষ্প। স্টিমকে অদৃশ্য বলা হয় কেন? স্টিমকে তো

আমরা দেখি, ফুটন্ত জলের কেটলির মুখ থেকে বেরুচ্ছে, কড়ার ওপর দেখা যাচ্ছে। সে কথায় পরে আসছি।

শুধু যে জল বাষ্প হয়, তা নয়। অন্য অনেক তরল পদার্থ থেকেও বাষ্প ওঠে, কোনটায় তাড়াতাড়ি, কোনটায় বা ধীরে ধীরে। জলের চেয়ে স্পিরিট তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়। কিন্তু প্রত্যেক তরল পদার্থ থেকে যে যথেষ্ট বাষ্প হয়, তা নয়। সরিষার তেল থেকে বাষ্প হয় না বললেই চলে, কিন্তু কেরোসিন তেল থেকে প্রচুর বাষ্প হতে থাকে।

জল থেকে বাষ্প উঠছে। বাষ্পে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তাপও চলে যায়, ফলে জল ঠাণ্ডা হয়। হাওয়া চলতে থাকলে জল তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়। শরীর ঘামছে, তখন যদি বাতাস খাওয়া যায়, ঘাম তাড়াতাড়ি বাষ্প হতে থাকে, শরীর থেকে তাপ তাড়াতাড়ি চলে যায়, শরীর বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। হাতে এক ফোঁটা স্পিরিট ঢেলে দিলুম, স্পিরিট বাষ্প হল, জায়গাটা ঠাণ্ডা হল। স্পিরিট দিয়ে সেখানে ফুঁ দিলে জায়গাটায় বেশি ঠাণ্ডা লাগে ; কারণ, তখন স্পিরিট তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়। গরম দুধ শিগ্‌গির জুড়াতে গেলে আমরা তার উপর হাওয়া করি। পিতলের কলসির জলের চেয়ে কুঁজোর জল বেশি ঠাণ্ডা হয় ; কারণ, বেলে-মাটি দিয়ে তৈরি বলে কুঁজোর বাইরের দিকটাও ভিজে থাকে, আর সেখান থেকে বাষ্প ওঠে। এই কুঁজো হাওয়াতে বসিয়ে রাখলে জল আরও চট্‌পট ঠাণ্ডা হয়। আরও একটা কথা আছে। যদি বাইরের বায়ু খুব শুকনো থাকে, তবে তাড়াতাড়ি বাষ্প ওঠে, বায়ু ভিজে থাকলে সে রকম বাষ্প হয় না। এই কারণে দেখা যায়, বর্ষাকালে কাপড় শুকাতে দেরি হয়, কিন্তু শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

বায়ুতে জলীয় বাষ্প

পৃথিবীর উপরটায় তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। এই জল থেকে, ভিজে মাটি থেকে, গাছপালা থেকে, সব সময় জলীয় বাষ্প উঠছে। এ বাষ্প যাচ্ছে কোথায় ? বায়ুর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু বায়ুর বাষ্প নেবার একটা সীমা আছে। তাছাড়া ঠাণ্ডা বায়ু যতটা বাষ্প নিতে পারে, গরম বায়ু তার চেয়ে বেশি পরিমাণ বাষ্প নেয়।

এখন ধরা যাক, বায়ু গরম, তাতে অনেক পরিমাণ বাষ্প আছে, যতটা নেবার নিয়েছে। সেই বায়ুকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করা হল। তখন কি হবে? খানিকটা বাষ্প জমে জল হবে।

আমরা দেখি, শ্লেটের উপর হাই দিলে ঘামের মতো জল জমে, ফুটন্ত জলের উপর একখানা ঠাণ্ডা থালা ধরলে তাতে বিন্দু বিন্দু জল জমে। গ্লাসের জলে বরফ দিলে গ্লাসের বাইরের পিঠে ফোঁটা ফোঁটা জল জমতে থাকে। এসব জল কোথা থেকে আসছে? গেলাসের জল কি গেলাস ফুঁড়ে বাইরে এল! তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই :

গরম বায়ু যতটা বাষ্প ধরে রাখতে পারে ধরে রাখল। এখন যদি এই বায়ুকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করা যায়, তবে ওই ঠাণ্ডা বায়ু অতটা বাষ্পকে আর বাষ্পের আকারে ধরে রাখতে পারবে না, খানিকটা জল হয়ে যাবে। হাই দিলে মুখের ভিতর থেকে গরম বায়ু বের হল, এতে প্রচুর বাষ্প রইল। ঠাণ্ডা শ্লেটের গায়ে লেগে সেই বায়ু ঠাণ্ডা হল, কিন্তু ওই ঠাণ্ডা বায়ু অতটা বাষ্প ধরে রাখতে পারল না, খানিকটা জমে বিন্দু বিন্দু জল হল। একই কারণে থালার গায়ে জলের ফোঁটা দেখা দিচ্ছে, আর গেলাসে বরফ-জল রাখলে তার বাইরেটা ঘামছে, ঘামে মানে হল খুব ছোট ছোট জলের ফোঁটা হয়। স্টিমও দেখা যায় না, বাষ্পও দেখা যায় না, তারা যখন ঠাণ্ডা হয়ে খুব ছোট ছোট জলকণার রূপ নেয় তখনই আমরা তাদের দেখি।

শিশির, কুয়াসা, বৃষ্টি

ভোরের বেলায় গাছের পাতায় পাতায়, ঘাসের ডগায় ডগায় ছোট ছোট জলের ফোঁটা দেখা যায়। এদের আমরা শিশির বলি। এদের উৎপত্তি হয় এই রকমে :

দিনের বেলায় নদ নদী খাল বিল পুকুর থেকে বাষ্প উঠল, বায়ুর সঙ্গে মিশে গেল। রাত্রে গাছপালা ও আশেপাশেরর বায়ু ঠাণ্ডা হতে থাকল। ওই ঠাণ্ডায় বায়ু আর অতটা বাষ্প ধরে রাখতে পারল ন, কিছুটা বিন্দু বিন্দু জলে পরিণত হল। পরিমাণে বেশি হয়ে যখন বড় বড় ফোঁটায় দাঁড়াল, সেই সব জলের ফোঁটা টপ্‌টপ করে পড়তে লাগল। এই হল শিশির। মেঘলা দিনে যে বেশি শিশির পড়ে না, তার কারণ এই :

মেঘ পৃথিবীর উপর একখানা কম্বলের মতো কাজ করে, পৃথিবী বেশি তাপ হারায় না, বায়ু গরমই থাকে, কাজেকাজেই তখন সে-বায়ুর বাষ্প বাষ্পের আকারেই থাকে।

ফুটন্ত জলের উপর, গরম ভাতের উপর ধোঁয়ার মতো যে জিনিস দেখা যায়, তা অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত বাষ্প ছাড়া আর কিছু নয়। মেঘও তাই। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের গরমে আমাদের দেশের বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে। ওই বাষ্প উপরের দিকে উঠে যায় ও খুব ঠাণ্ডা হয়, তখন বাষ্প খুব ছোট ছোট জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে মেঘের আকার ধারণ করে। যে সকল মেঘে শিগ্‌গির শিগ্‌গির বৃষ্টি হবে, তারা মাত্র এক মাইল দু মাইল উপরে থাকে, আর কাজলের মতো কাল দেখায়।

মাঘ-ফাগুন মাসের সকালে প্রায়ই কুয়াশা দেখা যায়। কুয়াশাও একরকম হাল্‌কা মেঘ ছাড়া আর কিছু নয়! পৃথিবীর গায়ে হলে আমরা কুয়াশা বলি, আর উপরে হলে বলি মেঘ।

মেঘ হবার পর মেঘের খুব ছোট ছোট জলকণা মিলতে লাগল; মিলে অপেক্ষাকৃত বড় বড় জলকণায় পরিণত হল। এই জলবিন্দুরা এখন ভারি হয়ে উঠল, কাজেই বায়ুতে আর ভেসে থাকতে পারল না, মাটিতে পড়তে লাগল। এই হল বৃষ্টি।

বায়ুর আর্দ্রতা

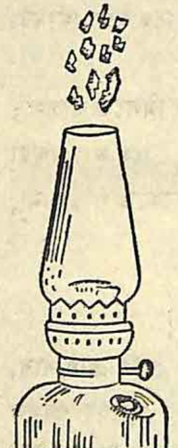
'দিল্লীতে খুব গরম বলি, কিন্তু কলকাতায় এসে দেখি প্রাণ যায়, কলকাতার গরম আরও বেশি'। এ-কথা যে বলল, খবরের কাগজ কিন্তু তার কথায় সায় দিল না। দেখা গেল, কলকাতার উষ্ণতা 98° ডিগ্রী, আর দিল্লীর উষ্ণতা তখন চলেছে 107°-108° ডিগ্রী। তবে কলকাতায় 'প্রাণ যায়' কথাটা ঠিক। দিল্লীর বায়ু শুকনো, কলকাতার বায়ু ভিজে। গরমের জন্যে আমরা যে কষ্ট বোধ করি, তা বায়ুর উষ্ণতার জন্যেও বটে, আর বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকার জন্যেও বটে। জলীয় বাষ্প থাকবার জন্যে ভাপ্‌সা গরম বোধ হয়, তাতে কষ্ট হয় বেশি।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কি রকম, তারও হিসেব খবরের কাগজে পাওয়া যায়। বায়ুতে কতটা জলীয় বাষ্প রয়েছে, আর তখন

সেই উষ্ণতায় ওই বায়ুকে জলীয় বাষ্পে ভরপুর করিতে কতটা বাষ্প দরকার, এই দুই-এর অনুপাত হল বায়ুর আর্দ্রতা। আর্দ্রতা 100 বললে ধরতে হবে, বায়ু বাষ্পে একেবারে ভরপুর। এ রকম অবশ্য দেখা যায় না। যদি দেখি আর্দ্রতা 98, তা হলে বুঝতে হবে, বায়ু খুব বেশি রকম ভিজে, বাষ্পে ভরপুর হবার একেবারে কাছাকাছি। আবার যদি দেখি আর্দ্রতা 25, তাহলে বায়ু খুব শুকনো বলে ধরতে হবে। আর্দ্রতা 0 হয় না, বায়ুতে কিছু কিছু বাষ্প থাকেই।

বায়ু-চলাচল

উনানে আগুন দেবার পর আমরা দেখি, উপর দিকে ধোঁয়া উঠছে। এই ধোঁয়া আর কিছু নয়, খুব ছোট ছোট কয়লার গুঁড়ো। কিন্তু এই কয়লার গুঁড়ো উপরে উঠবে কেন? কোন জিনিস গরম হলে অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়। উনানের উপরকার বায়ু গরম হল, অপেক্ষাকৃত হাল্কা হল, উপরে উঠতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কয়লার কণাগুলোকে উপরে তুলল। একটা চিমনির উপরে ছোট ছোট কাগজের টুকরো ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, টুকরোগুলো উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। গরম বায়ু উপরে উঠলে তার স্থান দখল করতে পাশ থেকে ঠাণ্ডা বায়ু আসতে থাকে।



চিত্র—2
গরম হাওয়ার জন্যে কাগজের টুকরো-গুলো উপরে উঠ-বার চেষ্টা করছে

চিমনিতেও গরম বায়ু উপরে উঠছে। একটি হারিকেন লণ্ঠনের চিমনির তলার দিকে চার পাশে অনেকগুলি ফুটো রেখে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে ভিতরে ঠাণ্ডা বায়ু আসবার জন্যেই ওই পথ রাখা হয়। এগুলি বন্ধ করে দিলে দেখা যাবে, বায়ুর অভাবে ভিতরের আলো নিবে গেল।

ঘরে লোকজন রয়েছে, তাদের শরীরের তাপে ঘরের ভিতরকার বায়ু গরম হচ্ছে, দূষিতও হচ্ছে। স্বাস্থ্যের জন্যে এই বায়ুকে বের করে দিয়ে পরিষ্কার বায়ু আনবার, অর্থাৎ ঘরে বায়ু-চলাচলের একটা ব্যবস্থা করার

বিশেষ প্রয়োজন হয়। এর জন্যে ঘরের দেয়ালের উপরের দিকে কিছু কিছু ফুটো রাখতে হয়, যাতে করে গরম বায়ু উপরে উঠে এই পথ দিয়ে বাইরে চলে যেতে পারে। কিন্তু ঘর থেকে যে বায়ু চলে গেল, তার জায়গা ভর্তি করতে নিচে দিয়ে বায়ু ঢোকবারও ব্যবস্থা করতে হবে।

উনানের তাপে বা চিমনির ভিতরকার দীপের তাপে যেমন বায়ু-চলাচলের সৃষ্টি হচ্ছে, সূর্যের তাপেও সেই রকম ঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এক জায়গায় বায়ু খুব গরম হল, উপরে উঠল, সেই স্থান দখল করতে আশেপাশের বায়ু ছুটে এল। এই হল ঝড়।

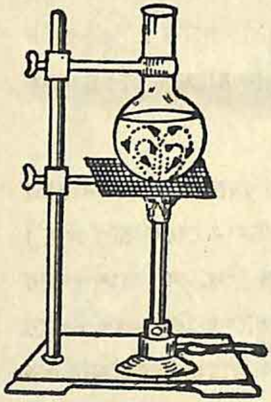
তাপ-চলাচল

একটি লোহার ডাণ্ডার একটা ধার উনানে দেওয়া হল, দেখা যাবে, আর একটা ধারও আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে। জলের হাঁড়ি উনানে বসান হল, অল্প সময়ের মধ্যে হাঁড়ির সমস্ত জল গরম হয়ে উঠবে। কত দূরে সূর্য রয়েছে, সেখান থেকেও আমরা তাপ পাচ্ছি। এর প্রতি ব্যাপারেই তাপ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছে। কিন্তু একই রকম উপায়ে নয়।

প্রথমে ওই লোহার ডাণ্ডাটার কথা ধরা যাক। যে কিনারাটা উনানের মধ্যে রইল, সেটা তো সোজাসুজি উনান থেকে তাপ পেল। এই অংশ তার পরের অংশকে খানিকটা তাপ দিল, সেই অংশও তার পরের অংশকে খানিকটা দিল, এই রকমে তাপের কিছু অংশ ওধারে গিয়ে পৌছল, এই রকম চলতে থাকল। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাপ যাবার এই হল একটা উপায়। কিন্তু এইভাবে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সমান পরিমাণে যায় না। কারুর মধ্য দিয়ে তাপ ভালভাবেই যায়, আবার কারুর মধ্য দিয়ে যেতেই চায় না। ধরা যাক, কাঠ। আমরা তো দেখি, একটা লম্বা কাঠের এক দিকটা জলছে, আর অপর দিকটা হাত দিয়ে বেশ ধরে রয়েছি, খুব অল্প পরিমাণ তাপই হাতে এসে পৌছচ্ছে। সাধারণত ধাতুর মধ্য দিয়ে তাপ ভালভাবেই যায়। কিন্তু আবার ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর মধ্যে এর ইতর-বিশেষ আছে। পিতলের মধ্য দিয়ে যেমন যায়, লোহার মধ্য দিয়ে সে রকম যায় না। তাই ফুটন্ত

ভাত হাঁড়ি থেকে তুলতে আমরা পিতলের হাতার বদলে লোহার হাতার ব্যবহার পছন্দ করি।

শীতকালে আমরা সাধারণত গরম জামা ব্যবহার করি। এই 'গরম' কথাটার মানে কি? একটা থার্মমিটার ওই জামার গায়ে ধরলে কি থার্মমিটারের পারা তড়্‌তড় করে উঠে যাবে! মোটেই তা নয়। ওই 'গরম' কথাটার মানে হল, ওই জামার মধ্য দিয়ে তাপ সহজে যাতায়াত করতে পারে না। কিন্তু শীতকালে এই রকমের জিনিস ব্যবহার করার সুবিধাটা কি? শীতকালে বাইরেটা খুব ঠাণ্ডা, আমাদের শরীর অপেক্ষাকৃত গরম, তাই আমাদের দেহ থেকে তাপ বাইরে চলে যায়, তাই আমরা খুব ঠাণ্ডা বোধ করি! এটা আমরা কি করে বাধা দেব? আমরা দেহকে এমন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখলুম, যার মধ্য দিয়ে সহজে তাপ বেরিয়ে যায় না, যেমন ফ্ল্যানেল, পশম প্রভৃতি। এতে দেহের তাপ যথেষ্ট পরিমাণে দেহেই থেকে যায়, আমাদের বেশি রকম ঠাণ্ডা বোধ হয় না।



চিত্র—3
নিচের গরম জল উপরে উঠল, উপরের ঠাণ্ডা জল নিচে নামল

তাপে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব কিছু কমে যায়, অর্থাৎ জিনিসটা অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়। ধরা যাক, কোন তরল বা গ্যাসীয় জিনিসের নিচে তাপ দেওয়া হতে থাকল। নিচের অংশ গরম হওয়া মাত্র তা অপেক্ষাকৃত হাল্কা হল, হাল্কা হওয়ায় উপরে উঠল, উপরের ভারী অংশ নিচে নামল। মনে করা যাক, জল সমেত একটা হাঁড়ি উনানে বসান হল। লোহা বা পিতল বা অ্যালুমিনিয়ামের মধ্য দিয়ে তাপ যেমন এ অংশ থেকে অন্য অংশে পর পর চলে যায়, জলের মধ্য দিয়ে সে রকম যায় না। তবুও হাঁড়ির জল শিগ্‌গির শিগগির গরম হয়। এখানে সমস্ত গরম হয় এইভাবে : হাঁড়ির তলার জল তাপ পেয়ে গরম হল, আর জলটা গরম হওয়ায় অপেক্ষাকৃত হাল্কা হল, সুতরাং উপরে উঠল, আর উপরের ঠাণ্ডা জল নিচে নেমে এল। নিচে নেমে এল যে-জল সে তখন গরম হতে

থাকল, উপরের জলের চেয়ে যেই বেশি গরম হল তখন তার চেয়ে হাল্কা হওয়ায়, এই জলই তখন আবার উপরে উঠল, আর সেখানকার জল নিচে নামল। এই রকম করে জলের উঠা-নামা চলল, ফলে কিছু সময়ের মধ্যে হাঁড়ির সমস্ত জলটা গরম হয়ে গেল।

লোহার ডাণ্ডা গরম হয়ে উঠা আর হাঁড়ির জল গরম হয়ে উঠা, এ দুটো ব্যাপারের মধ্যে তফাৎ হল এই। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষেতে জল দিতে হবে। পুকুর থেকে ক্ষেত অবধি লোক দাঁড়িয়ে আছে। পুকুর থেকে বালতি করে যে জল তুলল, সে তার পরবর্তী লোকের হাতে দিল, এই লোক তার পরের লোকের হাতে দিল, এই করে বালতি-বোঝাই জল পুকুর থেকে ক্ষেতে এসে পৌছল। এখানে লোক দাঁড়িয়ে, কিন্তু জল চলছে। এই রকম করে লোহার ডাণ্ডার মধ্য দিয়ে তাপ চলছিল। আবার ধরা যাক, অতগুলি লোকই আছে, প্রত্যেকের হাতে এক একটা বালতি, আর প্রত্যেকেই পুকুর থেকে জল নিয়ে ক্ষেতে ঢেলে আসছে, এখানে লোকও চলছে, সঙ্গে জলও চলছে। হাঁড়ির জল এই রকম ভাবেই গরম হচ্ছিল।

কিন্তু হাঁড়ির জল যেমন তাপ নিয়ে যাতায়াত করে, কোন কঠিন পদার্থের কণাগুলির পক্ষে সে রকম করা সম্ভব নয়; কারণ, তারা তো নড়াচড়া করতে পারে না। তবে তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থে ওই রকম সম্ভব। চিমনিতে নিচের বায়ু ওই রকমে হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়।

এখানে একটা বড় কথা রয়ে গিয়েছে। ন' কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য রয়েছে, সেই সূর্য থেকে তাপ আসছে কি করে? পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে কোন সরাসরি যোগ নেই, বায়ুও কয়েক শ মাইল গিয়ে শেষ হয়েছে, তারপর বিরাট শূন্যতা। তবে কি উপায়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ এসে পৌছচ্ছে!

বিজ্ঞানী এখানে একটা বড় রকমের কল্পনা করলেন। জল স্থল আকাশ সব কিছুর মধ্যে, যত দূর দেখা যায় তার মধ্যে, যেখানে দৃষ্টি পৌছয় না তারও মধ্যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে একটা কিছু আছে ধরে

নিলেন, তার নাম দিলেন ঈথর। এই ঈথরকে ছেঁকে নিয়ে আলাদা করা যায় না, বোতলে ভরে ওজন করা যায় না, এই ঈথর বিজ্ঞানীর একটা কল্পনা মাত্র। এর সম্বন্ধে একটা কথা শুধু ধরে নেওয়া হল যে, এই ঈথরে হরেক রকমের ঢেউ তোলা যায়, আর সেই ঢেউ ভীষণ বেগে চারিদিকে ছুটতে থাকে। এক রকমের ঢেউ আমাদের চোখের উপর পড়ে আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি দেয়, অন্য রকমের ঢেউ আমাদের দেহে তাপের অনুভূতি জাগায়। সূর্য থেকে এ দু-রকমের ঢেউই আমরা পাচ্ছি। তাই সূর্য তাপও দেয়, আলোও দেয়। একটা গরম জিনিস থেকেও ঢেউয়ের আকারে তাপ চলে যায়। একে বলা হয় তাপের বিকিরণ।

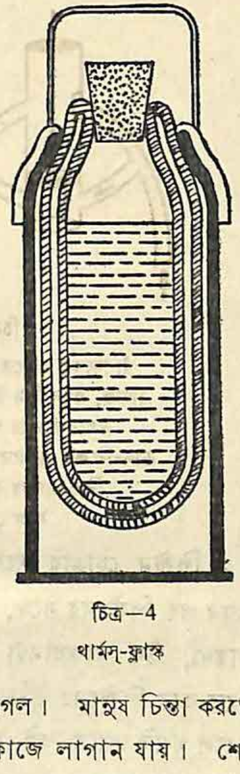
তাপ-বিকিরণে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। দুটো জিনিস আছে, একটা কাল একটা সাদা, দুটোই সমান গরম, আর উষ্ণতা একই। দেখা যায়, কাল জিনিসটা থেকে তাপ বিকিরণ হয় বেশি, সাদাটা থেকে কম। আমাদের চায়ের পেয়ালা সাদা না হয়ে কাল হলে চা খুব চট্‌পট ঠাণ্ডা হয়ে যেত। অন্যদিকে কাল জিনিস বেশি বিকিরণ-রশ্মি পেয়ে গরম হয় বেশি, সাদা জিনিস তত গরম হয় না, কারণ তার বিকিরণরশ্মি নেবার ক্ষমতা কম। গ্রীষ্মকালে আমাদের জামা সাদা হওয়া ভাল, সূর্য থেকে বিকিরণ-রশ্মি নেবে কম। আর আমাদের কাল ছাতার চেয়ে পাহারাওয়ালার সাদা ছাতা বিজ্ঞানসম্মত।

গরম জলকে, গরম দুধকে অনেকক্ষণ ধরে গরম রাখতে হবে। কি করে তা করা যেতে পারে ?

আগে দেখা গেল, তিনটি উপায়ে তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। এখন এমন পাত্রে জিনিসটা রাখা যাক, আর এমন ব্যবস্থা করা যাক, যাতে ওই তিনটি উপায়ে তাপ চলে যাওয়া অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছে, অবশ্য একেবারে বন্ধ করা যাবে না। যে পাত্রটা নেওয়া হল, তার বাইরেটা বেশ সাদা চক্‌চকে হবে। এতে তাপ বিকিরিত হয়ে খুব কমই চলে যাবে। তারপর ওই পাত্রটির চার ধার ঘিরে আর একটা পাত্র রইল, আর এই দুটি পাত্রের মাঝখান থেকে বায়ু বের করে নেওয়া হল। এতে করে বায়ুর চলাচলের জন্যে যেভাবে তাপ চলে যায় তা বন্ধ হল, কারণ মাঝে বায়ু তো নেই। এখন যে পাত্রে গরম জল বা চা

থাকবে, তাকে ওই বড় পাত্রটার মধ্যে ফ্লানেল বা সোলা বা ওই রকমের জিনিসের উপর বসান হল। এতে তাপ সহজে চলে যাবে না।

থার্মস্-ফ্লাস্ক এই রকমেই তৈরী করা হয়। আর এইভাবে তৈরি হওয়ায় এর মধ্যে গরম জিনিস রাখলে তা অনেকক্ষণ গরম থাকে, আবার ঠাণ্ডা জিনিসও অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে।



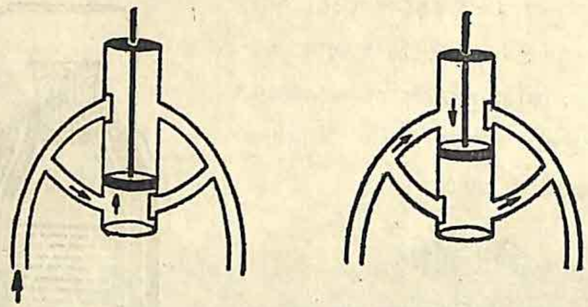
চিত্র—4
থার্মস্-ফ্লাস্ক

স্টিম-এঞ্জিন

সরা-চাপা হাঁড়িতে জল যখন ফুটতে থাকে, তখন সরাখানা ঢক্‌ঢক্ করে, আগের দিনের মানুষও তা দেখেছে। কিন্তু ওই দেখা অবধি, কেন ওই রকম উঠা-নামা করে, তা নিয়ে তখনকার মানুষ কোন রকম মাথা ঘামায় নি। তারপর অনেক দিন চলে গেল। একদিন একজন ভেবে দেখল যে, জল ফুটে যে স্টিম হয় নিশ্চয় সেই স্টিমের খুব শক্তি আছে, আর সেই শক্তি সরাটাকে ওঠাবার চেষ্টা করছে। আরও দিন গেল। মানুষ চিন্তা করতে থাকল, স্টিমের ওই যে শক্তি কি করে তাকে কাজে লাগান যায়। শেষ অবধি উপায় বেরল।

ধরা যাক, জল ফুটে যে স্টিম হয় সেই স্টিম একটা চোঙার মধ্যে ঢুকল। পিচকারির মধ্যে যেমন একটা পিস্টন থাকে, মনে করা যাক্, ওই চোঙার মধ্যে সেই রকমের একটা পিস্টন আছে, আর পিস্টনটা উঠানামা করতে পারে। এখন স্টিম চোঙার মধ্যে নিচে থেকে ঢুকে খুব জোরে পিস্টনের তলায় চাপ দিল, পিস্টনকে ঠেলে উপরে তুলল। হাতলটা যেই উপরে উঠল অমনি একটা ব্যবস্থা রইল যাতে স্টিম এখন নিচে দিয়ে চোঙার মধ্যে না গিয়ে উপর থেকে চোঙার মধ্যে ঢুকবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তলায় যে স্টিম ছিল তা ঠাণ্ডা জলভরা একটা পাত্রের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে। এই রকম হলে এখন পিস্টনে উপর থেকে চাপ এল, পিস্টন

নিচে নামল।। পিস্টনের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে যাতে এই রকমটা আপনা-আপনি হয়, সেই ব্যবস্থা করা হল।



চিত্র—5. ষ্টিম-এঞ্জিন

বাঁ-দিকের ছবিতে ষ্টিম পিষ্টনের তলায় ঢুকে উপরের দিকে ঠেলা দিচ্ছে, এখন ষ্টিম উপরের নল দিয়ে চোঙে ঢুকতে পাচ্ছে না, পিষ্টন উপরে উঠবার পর আপনা-আপনি নিচের পথ বন্ধ হল—
ডান-দিকের ছবিতে উপর দিকে ষ্টিম ঢুকে পিষ্টনকে নিচে ঠেলা দিল, এসময় তলাকার জায়গাটা ঠাণ্ডা-পাত্রে রাখা জলের সঙ্গে যোগ হয়ে গেছে, প্রথমে সেটা খোলা ছিল

পিস্টন চোঙার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি উঠা-নামা করতে থাকল। এখন এই পিস্টনের সঙ্গে, একখানা চাকার মাঝখানের কাছাকাছি একটা জায়গা, ঠিক মাঝখানটা নয়, একটা ডাণ্ডা দিয়ে যোগ করা আছে। এতে করে পিস্টনের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে চাকাটা ঘুরবে, আর চাকা ঘুরলে গাড়ি চলবে, এই হল মোটামুটি কথা। কিন্তু জিনিসটাকে ভাল রকমে দাঁড় করাতে অনেক কিছু করতে হয়েছে। অনেক কিছু যে করতে হয়েছে তা রেলগাড়ির একখানা এঞ্জিন লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে কত রকমের ব্যবস্থা তাতে রয়েছে।

আলো

আলো

আলোর অনুভূতি

অন্ধ বালক কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করল,—আলো কি? তাকে যদি বলা যায়,—দেখ বাপু, আলো আর কিছু নয়, ঈথরের একরকম ঢেউ, তাহলে সে কি কোন রকম সান্ত্বনা পাবে, না আলোর সম্বন্ধে তার কোন ধারণা হবে? আলো আমাদের একটা অনুভূতি, সেই অনুভূতি জাগাচ্ছে ঈথরের ঢেউ বা আর কিছু। অন্ধ বালক সেই অনুভূতি হারিয়েছে, বাইরে ঈথরের ঢেউ থাক বা না-থাক, তার তাতে কি? সে যে-তিমিরে সেই তিমিরে। পৃথিবীতে প্রাণী আছে, তাই আলো আছে। প্রাণী যদি না থাকত, বা প্রাণী থেকেও ওই ঈথরের ঢেউ-এর অনুভূতি জাগাবার মতো কোন অঙ্গ তার দেহে যদি না থাকত, তবে কোথায় আলো, কোথায় আলো।

স্বয়ম্প্রভ পদার্থ

আমরা যা কিছু দেখছি তাদের মধ্যে কোন কোনটি তার নিজস্ব আলো দেয়, অন্যগুলির নিজেদের কোন আলো নেই, অপরের থেকে পাওয়া আলো তারা ছড়ায়, এইমাত্র। সূর্য যে আলো দিচ্ছে সে তার নিজের আলো, নক্ষত্রের আলোও তার নিজের। ওই যে প্রদীপ জ্বলছে, একটি জোনাকি ক্ষীণ আলো দিচ্ছে, যার মধ্যে শুধু আলোই আছে তাপ নেই, এদেরও আলো তাদের নিজস্ব। কিন্তু চাঁদের আলো তার নিজের আলো নয়, সূর্য থেকে পাওয়া আলোর কিছু পরিমাণ সে আমাদের দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সামনে লোকজন, বাড়িঘর আসবাবপত্র দেখছি, দূরে গাছপালা দেখছি, এদের কারও নিজের আলো নেই, অপর থেকে পাওয়া আলোতে এরা আলোকিত। তাই অমাবস্যার রাত্রে যখন এরা সূর্যের আলো পায় না, আর চন্দ্রের আলো থেকেও বঞ্চিত, তখন এদের আমরা দেখি না।

যে আলো দিচ্ছে না, অনেক সময় গরম করতে থাকলে তার থেকে আলো বেরয়। লোহা আলো দেয় না, কিন্তু উনানের মধ্যে তাকে অনেকক্ষণ রাখলে তার থেকে লাল্‌চে আলো বেরতে থাকে। একটা সরু তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠাতে থাকলে শেষ অবধি সে গরম হয়ে আলো দিতে থাকে।

স্বচ্ছ ও অনচ্ছ পদার্থ

কতকগুলি পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো অবাধে চলে যায়, যেমন—বায়ু, জল, কাচ, হীরা প্রভৃতি। এদের বলা হয় স্বচ্ছ পদার্থ। আবার কতকগুলি পদার্থের মধ্যে দিয়ে আলো যায় না, যেমন—কাঠ, পাথর, ধাতু প্রভৃতি। এরা অনচ্ছ। আবার মাঝামাঝি এক শ্রেণীর পদার্থ আছে যাদের ভিতর দিয়ে কিছু পরিমাণ আলো যায় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে দিয়ে অপর দিকের জিনিস দেখা যায় না। ঘষা কাচ এই রকমের ঈষদচ্ছ জিনিস।

কিন্তু পুরাপুরি স্বচ্ছ বলে কিছু নেই, আবার একেবারে অনচ্ছও কিছু নয়। বায়ু তো স্বচ্ছ, কিন্তু এই বায়ুও কিছু পরিমাণ আলো শুষে নেয়। মধ্যাহ্ন কালের সূর্যের চেয়ে সকাল-সন্ধ্যায় সূর্য যে ম্লান দেখায় তার কারণ হল এই যে, সূর্য থেকে যে আলো আসছে সকাল-সন্ধ্যায় তাকে অনেকটা গভীর বায়ুস্তর ভেদ করে আসতে হয়। অন্য দিকে ভূষা তো অনচ্ছ, কিন্তু কাচে ভূষা মাখিয়ে সূর্যকে দেখলে সূর্য ম্লান দেখায় বটে, কিন্তু ঢাকা পড়ে না।

কথাটা হেঁয়ালির মতো শুনতে হলেও কথাটা ঠিক যে, আমরা আলো দেখি না। তবে দেখি কি? দেখি আলোকিত জিনিস। ঘরের দরজা-জানোলা বন্ধ, খড়খড়ির একটা ফুটো দিয়ে ঘরে রোদ ঢুকছে, ওই রোদের পথে যে অসংখ্য ধূলিকণা আলোকিত হচ্ছে আমরা তাদেরই দেখি। মোটর গাড়ি বা স্টিমার থেকে যে অনুসন্ধানী আলো বেরয়, তাদের পথে বায়ুতে যে ধূলিকণা ওই রকমের ছোট ছোট জিনিস আমরা শুধু তাদেরই দেখি।

আলোক-রশ্মি

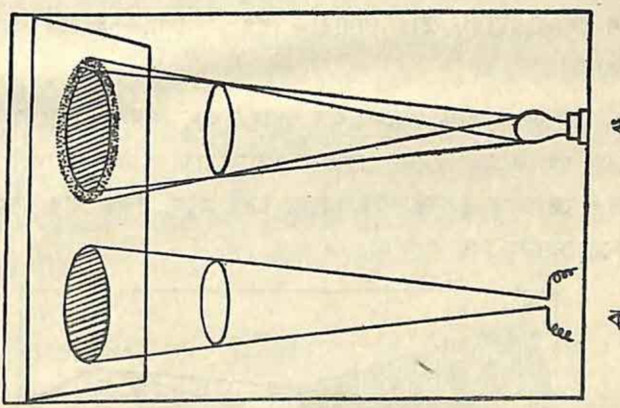
আলোর প্রকৃতি যাই হোক, ছোট ছোট কণা ছুটুক বা ঢেউ চলুক,

আমরা মোটামুটি ধরে নেব যে, আলোকিত বস্তু থেকে চারদিকে রশ্মি বেরচ্ছে। এই সব রশ্মি সোজা চলে। ব্যাপারটা কাজে লাগিয়ে খুব সহজে একটা ক্যামেরা তৈরি করা যায়।

একটা বাক্স কাল কাগজ দিয়ে মোড়া। এর একদিকের ঢাকনায় খুব সরু একটা ফুটো আছে, আর এর অপর দিকের ঢাকনাটা ঘষা কাচের, এটা সহজে খোলা যায়, আবার পরান যায়। বাক্সের ফুটোটা একটা বাড়ির দিকে মুখ করিয়ে ধরলে দেখা যাবে, ঘষা কাচের উপর বাড়ির একটা উল্টো ছবি পড়ল। এখন ঘষা কাচখানা সরিয়ে সেখানে একটা ফটোগ্রাফি-কাচ বসালে তার উপর ওই বাড়ির ছবি উঠবে।

ছায়া

আলোর অভাবই হল ছায়া। আলো সরল রেখায় চলে, পাশ কাটিয়ে যায় না, সেই কারণে অনচ্ছ পদার্থের পিছনে ছায়া পড়ে।



চিত্র—6.

ক—আলোটা খুব ছোট জায়গা থেকে আসছে, ঘোর অন্ধকার ছায়ার চারধারে পুরা আলো

খ—দীপটা একটু বড়, তবে অনচ্ছ পদার্থের চেয়ে ছোট, এখন ছায়ার মাঝের ঘোর অন্ধকারের পাশে আবছায়া, তার চারদিকে পুরা আলো

চোখের সুমুখে হাতটা ধরে আমরা সূর্যকে আড়াল করতে পারি; কারণ, সূর্য থেকে যে রশ্মি আসছে, তা আমার হাত ভেদ করেও আসতে পারে

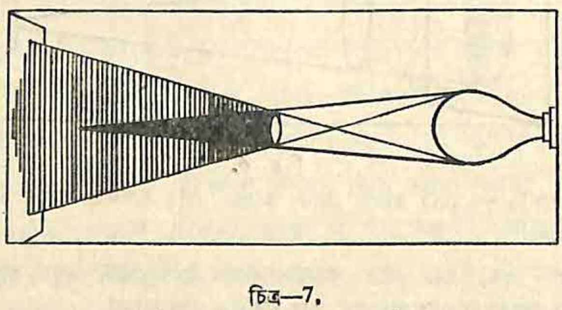
না, হাতের পাশ দিয়ে বেঁকতেও পারে না। অতি সূক্ষ্ম হিসেবে আলোক-রশ্মি অবশ্য ঈষৎ বেঁকে, কিন্তু সে কথা এখানে থাক।

একটি অনচ্ছ পদার্থের বাধায় ছায়া কি রকম হবে, তা নির্ভর করবে দীপের আয়তনের উপর।

ধরা যাক, দীপটা খুবই ছোট। এখানে যে ছায়া পর্দায় পড়ছে তার মধ্যে একটাও রশ্মি আসছে না, সুতরাং ছায়াটা ঘোর কাল, আর এই কাল ছায়ার চারদিকে পুরা আলো, সেখানে কোন রশ্মি আসনে বাধা পাচ্ছে না। এখানে আলো ও ছায়ার মধ্যে তফাৎটা বেশ স্পষ্ট।

এখন ধরা যাক, দীপটা একটু বড়, তবে এই অনচ্ছ পদার্থের চেয়ে ছোট। এখন দেখা যাচ্ছে, ছায়ার মাঝখানটা আগের মতই অন্ধকার, সেখানে একটুও আলো পড়ছে না, কিন্তু এর ঠিক চারদিকের বেড়টা পুরা আলো পাচ্ছে না, আবার পুরা অন্ধকারেও নেই। কতক কতক রশ্মি এখানে এসে পড়েছে, কতকগুলি আটকে যাচ্ছে। মাঝের অন্ধকারের পাশে এই আবছায়া, তার চারদিকে পুরা আলো,—এখানে এই রকম হচ্ছে।

এইবার ধরা যাক, আলোকিত পদার্থটি বড়, অনচ্ছ পদার্থের চেয়েও বড়। এখানে দেখা যাচ্ছে, একটা জায়গা রয়েছে, অনচ্ছ পদার্থটাকে যার চেয়ে কাছে ধরলে ছায়ার রকম আগের মতই হবে, কিন্তু যার চেয়ে দূরে থাকলে মোটেই ছায়া হবে না।



চিত্র—7.
আলোকিত পদার্থ অনচ্ছ পদার্থের চেয়ে বড়, পর্দা কাছে ধরলে ছায়া আগের মতোই হবে, দূরে ধরলে কোন ছায়া পড়বে না

রোদে একটা পাখি উড়ছে। পাখি যদি মাটি থেকে অল্প একটু

উপরে ওড়ে, তবে মাটিতে ছায়া পড়বে, মাঝখানটা ঘনছায়া, ঘনছায়ার চারদিকে আবছায়া, তারপরে আলো। কিন্তু পাখি একটু বেশি উপরে উঠলে কোন ছায়াই পড়বে না। ঠিক আগেকার ব্যাপারটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক। এখানে সূর্য হল আলোকিত পদার্থ, পাখি অনচ্ছ বস্তু, আর পৃথিবী হল পর্দা। পর্দা ঠিক জায়গায় আছে, নড়াচড়া করছে অনচ্ছ বস্তু ওই পাখি। পৃথিবী আর পাখির মধ্যে ব্যবধান যখন বেশি হচ্ছে, তখন আর ছায়া পড়ছে না।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ আলো-ছায়ারই ব্যাপার। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, আবার পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ঘুরছে। মনে করা যাক, পৃথিবী ও চন্দ্র ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের সঙ্গে এক সরল রেখায় এসে হাজির হল, প্রথম সূর্য, তারপর চন্দ্র, তারপর পৃথিবী। সূর্য হল আলোকিত পদার্থ, চন্দ্র মাঝের অনচ্ছ পদার্থ, আর পৃথিবী পর্দা। অনচ্ছ পদার্থ চন্দ্রের তুলনায় জ্যোতিষ্মান সূর্য অনেক বড়, সুতরাং ছায়াপাত শেষের ব্যাপারটির মত হবে।

এখানে পৃথিবীরূপ পর্দা বেশি দূরে নেই. সেইজন্য পৃথিবীর উপর চন্দ্রের ছায়া পড়ছে, কিন্তু খুব কাছেও নেই, সুতরাং ছায়াটা বেশি জায়গা জুড়ে পড়ে না। পৃথিবীর যেটুকু জায়গায় এই ছায়া পড়ছে, সেখান থেকে সূর্যের একটুও দেখা যাচ্ছে না, সেখানে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। এর চারদিকের পাশের জায়গাটায় আবছায়া, কাজেকাজেই সে সব জায়গা থেকে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে।

ঠিক সেই রকম যখন সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরল রেখায় এসে পড়বে, তখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে চন্দ্র যাবে, চন্দ্রগ্রহণ হবে। ছায়াঁর মধ্যে ঢুকলে তবে চন্দ্রগ্রহণ হবে, পাশের আবছায়ার মধ্যে গেলে চন্দ্র একটু ম্লান দেখাবে, কিন্তু গ্রহণ হবে না। ছায়ার মধ্যে চন্দ্রের সবটা যদি যায়, তবে পূর্ণগ্রাস্‌ চন্দ্রগ্রহণ হবে।

প্রতিফলন

সকাল বেলায় পূর্ব দিক থেকে সূর্যের রশ্মি এসে পুকুরের জলের উপর পড়ল। দেখা গেল, এই রশ্মি জল থেকে আবার বায়ুর মধ্যে পশ্চিমমুখো

চলল। ভাল করে লক্ষ্য করলে ওটাও দেখা যাবে যে, ওই সব রশ্মি জলের উপরে এসে পড়বার সময় যতটুকু হেলে নেমেছিল, উঠবার সময় ততটুকু হেলে উঠেছে।

জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে রোদ ঢুকে ঘরের মেঝেতে পড়ছে। ওই রোদ দেওয়ালে টাঙান একখানা ছবির উপর ফেলতে চাই। কি করে ফেলব? মেঝের উপর যেখানে রোদ আসছে, সেখানে একখানা আয়না ধরলেই হবে। কিন্তু আয়নাখানা যেমন খুশি বসালে চলবে না। ঠিকমতো হেলিয়ে ধরতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হলে রোদ ছবি থেকে সরে অন্য জায়গায় পড়বে।

আলোকিত বস্তু থেকে আলো বেরিয়ে সরল রেখায় চলল। কিন্তু আলোর রশ্মি সোজা চলতে চলতে যদি একটা চক্‌চকে সমতল জিনিসের উপর পড়ে, তবে সেখানে প্রতিফলিত হয়, অন্য পথ ধরে। আর এরূপ প্রতিফলন সম্বন্ধে নিয়ম হল এই যে, ওই রশ্মি চক্‌চকে তলের উপর যতটা হেলে পড়ে, বিপরীত দিকে ঠিক ততটা হেলেই ওঠে, উঠেই আবার সরল রেখায় চলতে থাকে।

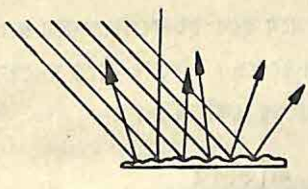
কিন্তু প্রতিফলনের পর আলোর জোর অনেকটা কমে আসে, পড়বার সময় আলো যতটা উজ্জ্বল ছিল প্রতিফলনের পর আর ততটা উজ্জ্বল থাকে না; কারণ, যার উপর পড়ে সে কতকটা আলো শুষে নেয়। কাল জিনিস প্রায় সবটাই শুষে নেয়। সেখান থেকে প্রতিফলন হয় না বললেই চলে। ঘষা কাচ থেকে সামান্যই প্রতিফলন হয়। সব চেয়ে ভাল প্রতিফলন হয় পারা থেকে, রুপা থেকে। কিন্তু এ-সব জিনিসও প্রায় চারভাগের একভাগ আলো শুষে নেয়।

সব কাজের জন্যে আমরা ভাল প্রতিফলন চাইনে। বায়স্কোপে যে পর্দার উপর ছবি পড়ছে, মনে করা যাক, সেই পর্দার বদলে সেখানে একখানা বড় আয়না বসালুম। খুব ভাল প্রতিফলন হতে থাকল। এখন ব্যাপারটা হবে এই, যন্ত্র থেকে আলো এসে ওই আয়নায় পড়ে যে দিকে প্রতিফলিত হবে, শুধু সেই দিকের লোকই ওই ছবি দেখতে পাবে, অন্য দিকের লোক দেখবে না।

একটা অন্ধকার ঘরে জানালার ফুটো দিয়ে রোদ এসে একটা আয়নার উপর পড়ল। আয়নাটা খুব চক্‌চকে। আয়নার উপর আলো পড়ে যে পথে চলল, সেখান থেকে আয়নার দিকে তাকালে আমরা আয়না দেখব না, দেখব ওই জ্যোতিষ্মান সূর্য যার থেকে আলো আসছে। এখন আয়নার বদলে যদি একখানা সাদা কাগজ ধরি, তবে ওই আলোর উৎস সূর্যকে না দেখে দেখব ওই কাগজখানা। কিন্তু কেন এরকম হয়?

ছড়িয়ে পড়া আলো

ওই কাগজখানা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, ওটা আদৌ মসৃণ নয়, একেবারে এবড়ো-খেবড়ো। শুধু কাগজ নয়, পালিশ-করা কাঠ, সিমেণ্টের মেঝে প্রভৃতি, যাদের আমরা মসৃণ বলে মনে করি, তারাও মসৃণ নয়। এ রকম জায়গায় আলো পড়লে কি হবে?



চিত্র—8
যার উপর আলো পড়ছে সেটা মসৃণ না হওয়ায় আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে

আলো চারদিক ছড়িয়ে পড়বে। এই রকম ছড়ানো আলোর জন্যে আমরা জিনিসপত্র দেখতে পাই। ঘরের মধ্যে রোদ ঢুকছে না, তবুও আমরা ঘরের মধ্যে আলো পাচ্ছি, জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি ওই ছড়িয়ে-পড়া আলোর জন্যে। বায়ুতে খুব ছোট ছোট ধূলিকণা ভাসছে, তার থেকে, মেঘ থেকে, মাটি থেকে, আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আয়না

আমরা সচরাচর যে-সব আয়না ব্যবহার করি, তার পিছনটাই আয়নার কাজ করে, সামনের কাচ থেকে প্রতিফলন হয় অতি সামান্যই। পিছনের দিকটায় টিন ও পারার একটা অ্যামালগাম মাখান থাকে। এটা খুব চক্‌চকে জিনিস, কাজেই বেশির ভাগ প্রতিফলন এখান থেকেই হয়।

কোন্ দিকে দেখি ?

চোখ সম্বন্ধে একটা ব্যাপার হল এই যে, যে-দিক থেকে আলোর রশ্মি চোখে ঢুকছে, আমরা সেই দিকে আলোকিত বস্তুটি দেখি। সুমুখে একটা দীপ জ্বলছে, দীপ থেকে আলোর রশ্মি বেরিয়ে আমার চোখে ঢুকল, সেই রেখায় দীপটিকে আমি দেখলুম, এখানে কোন গণ্ডগোল রইল না। কিন্তু মনে করা যাক, দীপ থেকে যে- রশ্মি বেরল তার কতক একটা আয়নায় প্রতিফলিত হল, আর যে দিকে প্রতিফলিত হল সেই দিকে চলে তা আমার চোখে ঢুকল। এখন আলোকিত বস্তুকে এই দিকেই দেখব, সে সত্য সত্য যে-দিকে আছে সে-দিকে দেখব না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। সূর্যের রশ্মি জলের উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ এসে ঢুকল। এই দিকেই আমি সূর্যকে দেখব, অর্থাৎ মনে হবে সূর্য জলের তলায় রয়েছে, কিন্তু আসলে সূর্য তো উপরে আকাশে রয়েছে। জলের নীচে যা দেখছি, তা সূর্যের প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব চোখের একটা ধাঁধা।

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব

আমরা অনেক রকমের প্রতিবিম্ব দেখি।

আমরা আয়নার সুমুখে দাঁড়ালে আমাদের দেহের প্রতিবিম্ব দেখি। একখানা ফটোগ্রাফি-কাচের উপর বাইরের দৃশ্যের একটা প্রতিবিম্ব পড়ে। সিনেমার পর্দার উপর ফিল্‌মে নেওয়া ছবির প্রতিবিম্ব পড়ে।

এই যে কয়েক রকম প্রতিবিম্বের কথা বলা হল, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সত্য সত্য কোন একটা জায়গায় পড়েছে, আর কোথাও আদৌ তার অস্তিত্ব নেই, সে প্রতিবিম্ব শুধু চোখের একটা ধাঁধা। ফটোগ্রাফি কাচের উপর বা সিনেমার পর্দার উপর যে প্রতিবিম্ব পড়ল, তা সত্য সত্যই সেখানে পড়ল, সেখানে তার একটা অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ওই সমতল আয়নার পিছনে যে-ছবি দেখছি, তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আয়নার পিছনে যদি একখানা কাগজ ধরি, কাগজের উপর কিছুই পাওয়া যাবে না।

আয়নার পিছনে যে প্রতিবিম্ব দেখি তার কোন অস্তিত্ব না থাকলেও ঠিক কোথায় তাকে দেখি তার হিসেব আছে। সেই হিসেব থেকে পাওয়া

যায়, সামনে যতটা দূরে আমি রয়েছি, পিছনে ঠিক ততটা দূরে ছবিটা দেখব।

আর একটা মজার ব্যাপার আছে। আমি যদি আয়নার সামনে ডান হাত তুলে দাঁড়াই, তবে আমার প্রতিবিম্ব বাঁ হাত তুলে আছে বলে মনে হবে। কারণ হচ্ছে এই, প্রতিবিম্ব তো ঠিক সোজা সুজি হবে, এমন হবে, এখন দুজন লোক যদি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে, তবে একজনের ডান হাতের সোজাসুজি অন্য জনের বাঁ হাত হবে।

সমতল আয়নায় প্রতিবিম্ব কোথায় হবে, কি রকম হবে, আর একবার দেখা যাক। একখানা সমতল আয়নার সামনে একটা বাতি জলছে। আয়না থেকে বাতিটা সামনে যতদূরে আছে, প্রতিবিম্ব পিছনে ততদূরে দেখা যাবে। এই প্রতিবিম্বের কোন বাস্তব সত্তা থাকবে না, অর্থাৎ পর্দার উপরে ওই প্রতিবিম্বকে ফেলা যাবে না। প্রতিবিম্বের আয়তন জিনিসটার আয়তনের সমান হবে, আর প্রতিবিম্বটা পাশাপাশি দিকে উল্টে আছে দেখা যাবে।

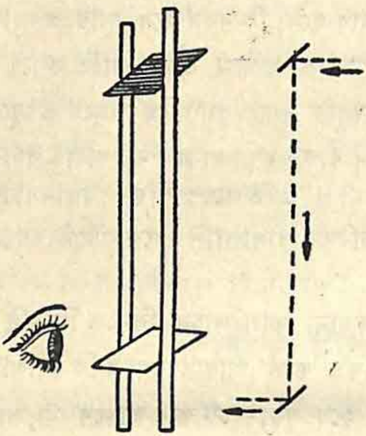
আচ্ছা, আমরা বাজারে একখানা ভাল আয়না কিনতে গিয়েছি। আমরা কি কি যাচাই করে নেব? কিন্তু 'ভাল' আয়না বলতে কি বোঝায় আগে দেখা যাক। আয়নার কাচটা হবে পুরু,—চট করে ভাঙবে না, আর আয়নার ক্ষেত্র হবে একেবারে সমতল, সমতল যদি না হয় তবে তো প্রতিবিম্ব বেঁকেচুরে যাবে। দ্বিতীয় ব্যাপারটা সহজেই ঠিক করা যায়। ওই ঘরের কড়ি বা অন্য কোন জিনিস একটা নেওয়া যাক, যা সরল রেখায় আছে। আয়নার নানা দিক থেকে তার প্রতিবিম্ব দেখলুম। সব সময় যদি দেখি যে প্রতিবিম্বটা সেই রকম সরল রেখায় আছে, কোথাও বেঁকেচুরে যায় নি, তাহলে বুঝব আয়নাটা সমতল। এইবার দেখতে হবে আয়নাটা পুরু কত? আয়নার চারধার তো ফ্রেম দিয়ে আঁটা, সে দিক দিয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই। বেশ, আয়নার কাচের উপর আঙুলটা বসালুম, আঙুলের প্রতিবিম্ব দেখলুম। এখন প্রতিবিম্ব তো দেখা যাচ্ছে কাচের অপর দিকের তল থেকে সমান দূরে। আঙুলের ডগা থেকে তার প্রতিবিম্বের দূরত্ব কত একটা হিসেব করলুম। কাচটা পুরু হবে তার অর্ধেক।

আর একটা কথা এখানে বলে রাখা যাক। পুকুরের জল স্থির আছে। চাঁদ উঠেছে, জলের নিচে চাঁদের প্রতিবিম্ব বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ধরা যাক, জলে ঢেউ চলেছে। এখন জলের তল আর সমতল নেই, কাজে-কাজেই আগের মতো পরিষ্কার প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না, দেখা যাবে একটা টানা লম্বা আলো।

একাধিক দর্পণে প্রতিফলন

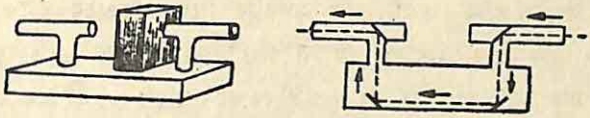
ফুটবল খেলার মাঠে যারা ভিড়ের পিছনে থাকে, তারা একরকম যন্ত্র ব্যবহার করে, যা দিয়ে সামনে লোকজন থাকলেও খেলার মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। ওই যন্ত্রে আর কিছু নয়, দুখানা আয়না প্রায় সমান্তরালভাবে আছে, আর আয়নাদুটোকে একটু এদিক-ওদিক নাড়ান যায়। খেলার মাঠ থেকে, খেলোয়াড়দের দেহ থেকে, বল থেকে যে-আলো আসছে তা উপরের আয়নায় পড়ে প্রতিফলিত হল, প্রতিফলিত রশ্মি দ্বিতীয় আয়নায় পড়ল, দ্বিতীয় আয়না থেকে আবার প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে ঢুকল। এতে করে আমার চোখের সোজাসুজি বাধা থাকলেও প্রতিফলিত রশ্মি উপর দিয়ে ঘুরে, বাধা কাটিয়ে, আমার চোখে পৌঁছল।



চিত্র—9.
সামনের বাধা থাকলে দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে

আর একটি ভারি মজারযন্ত্র তৈয়ারি করা যেতে পারে। দুটো নল সামনা-সামনি রয়েছে। নল দুটির ভিতর দিয়ে সামনের জিনিস দেখা যাচ্ছে। এখন নলদুটির মাঝখানে ইট, পাথর, কালি-ভরা দোয়াত, যা-কিছু ধরি না কেন, বাইরের জিনিস যেমন দেখা যাচ্ছিল সেই রকমই দেখা যাবে। কিন্তু ওসব জিনিস তো স্বচ্ছ নয়, ওদের ভিতর দিয়ে আলো আসবে কি করে? আসল ব্যাপার হচ্ছে এই : নলদুটির ভিতর দিয়ে আলো সোজাসুজি আসছে না। নলদুটি, আর ওদের ধরবার যে হাতল রয়েছে, তাদের মধ্যে চারখানা ছোট ছোট আয়না

লুকান রয়েছে। সামনের জিনিসের প্রতিফলিত আলো প্রথম নলে ঢুকে এক-একখানি আয়নায় ক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত হয়ে মোড় ফিরতে



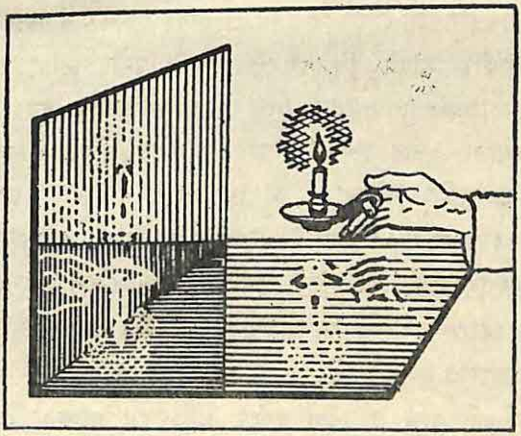
চিত্র—10

আলো পর পর চারখানা আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখে ঢুকছে, ইটখানা নল-ছটির মাঝে থাকলেও আলোর পথে নেই

ফিরতে অনেক পথ ঘুরে শেষে চতুর্থ আয়না থেকে বেরিয়ে আমার চোখে ঢুকছে। কাজেই সামনের জিনিসের প্রতিবিম্ব একই ভাবে দেখা যাচ্ছে; ইট, পাথর, কালির দোয়াত নলছটির মাঝে থাকলেও আলোর পথে নেই।

ছখানা আয়নায় প্রতিবিম্ব

ছখানা আয়না ধরে দেখলে অনেকগুলি প্রতিবিম্ব দেখা যায়।



চিত্র—11

আয়না-ছটির মধ্যে কোণ 90 ডিগ্রী, তিনটি প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে

ধরা যাক, আয়না ছটি সমান্তরালে আছে। আয়না ছটির মাঝে কোন জায়গায় একটি বাতি জলছে। একটা আয়নার দিকে তাকালে

দেখব, একটার পিছু আর একটা, এই রকম পর-পর অসংখ্য প্রতিবিম্ব রয়েছে। অন্য আয়নার দিকেও সেই রকম দেখব।

আয়না দুটির একটি যদি অপরটির সঙ্গে লম্বভাবে থাকে, অর্থাৎ আয়নাদুটির মধ্যে কোণ যদি হয় 90° ডিগ্রী, তবে তিনটি প্রতিবিম্ব হবে। কোণ যদি 60° ডিগ্রী হয়, তবে প্রতিবিম্ব হবে পাঁচটি। এই রকমে আয়না সাজিয়ে একটা খেলনা তৈরি হয়েছে, যা প্রত্যেক ছেলেমেয়ে জানে। ইংরেজিতে এর একটা বিট্‌কেল নাম আছে,—ক্যালিডস্কোপ। এতে তিনখানা আয়না 60° ডিগ্রী কোণে বসান আছে, আর এদের মাঝে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাচের টুকরা আছে। প্রতি রঙিন কাচের পাঁচটি করে প্রতিবিম্ব হচ্ছে, সুতরাং কাচগুলি ও তাদের প্রতিবিম্ব নিয়ে ছ-কোণাওয়ালা একটা চমৎকার প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে। নলটা একটু ঘোরালে কাচগুলি যেখানে যে রকম রয়েছে, তা আর থাকবে না, কাজে-কাজেই প্যাটার্নের রূপ ক্রমাগত বদলাবে।

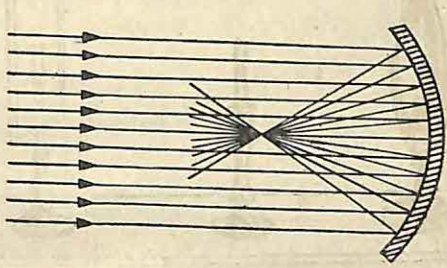
গোলকীয় দর্পণে প্রতিবিম্ব

একটা গোলকীয় দর্পণে কি রকম প্রতিবিম্ব হয় এবার আমরা দেখব ; কিন্তু গোলকীয় আয়না কি রকম? যে আয়নায় সাধারণত আমরা মুখ দেখি, তাতে একটা সমতল ক্ষেত্রে থেকে প্রতিফলন হয়। কিন্তু ধরা যাক, একখানা কড়ার ভিতরটা আয়নার মতো চক্‌চকে করা হয়েছে, এ একটা গোলকীয় আয়না। আবার কড়ার বাইরেটা চক্‌চকে করা হলে সেটা হবে আর এক রকমের গোলকীয় আয়না। প্রথমটায় আয়নার তলটা নেমে গিয়েছে, দ্বিতীয়টায় তলটা সামনে ঠেলে এসেছে। প্রথম ধরণের আয়নাকে বলা হয় অবতল আয়না, দ্বিতীয় ধরণের আয়নাকে বলা হয় উত্তল আয়না।

প্রথম ধরা যাক, অবতল দর্পণে প্রতিফলন হচ্ছে। প্রতিবিম্ব কি রকম হবে, কোথায় হবে?

সূর্য বহু দূরে রয়েছে, সূর্য থেকে যে সব রশ্মি আসছে, তারা সমান্তরাল বলে ধরা যেতে পারে। সূর্যের আলোতে একটি অবতল দর্পণ ধরা হল। দর্পণের উপর কতকগুলি সমান্তরাল রশ্মি এসে পড়ল। প্রত্যেক রশ্মির

প্রতিফলন হল। প্রতিফলন যেখানেই হোক, প্রতিফলনের নিয়মের কোন নড়চড় হবে না। সেই নিয়ম খাটিয়ে আমরা দেখি যে, অবতল আয়না থেকে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি সমান্তরালে বেরল না, প্রতিফলনের পরে কিছু দূরে এসে তারা এক জায়গায় সব মিলল। তাই এই জায়গায় আলোর জোর খুব বেশি হল। আর শুধু কি আলোর জোর! আলোর রশ্মির সঙ্গে তাপের রশ্মিও আসছিল। প্রতিফলনের পর আলোর রশ্মি যেখানে মিলল, তাপের রশ্মিও সেইখানে মিলল। এইখানটাকে বলা হয় ওই দর্পণের প্রধান ফোকস। একখানা অবতল দর্পণ যোগাড় করে রোদে



চিত্র—12

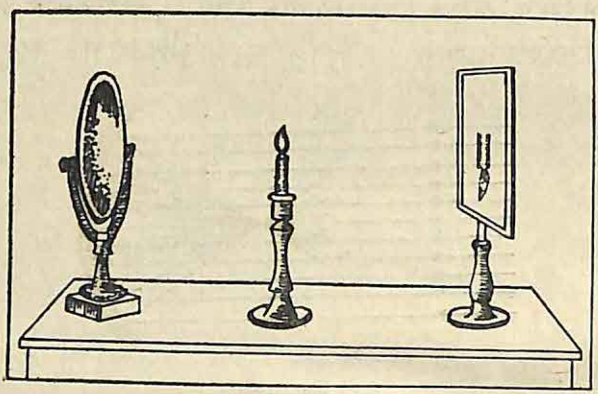
সমান্তরাল রশ্মি প্রতিফলনের পর এক জায়গায় মিলল

ধরলে এই প্রধান ফোকস বেশ দেখা যাবে, আলোর জোর এখানে খুব বেশি, আর জায়গাটা এত গরম হবে যে, একখানা কাগজ ধরলে কাগজখানা জ্বলে উঠবে।

অবতল আয়নায় যে প্রতিবিম্ব হয় তা বড় মজার। সমতল দর্পণে কি রকম প্রতিবিম্ব হয় মনে করা যাক। প্রতিবিম্বের কোন বাস্তব সত্তা নেই, অর্থাৎ চোখ শুধু তাকে দেখে, কিন্তু পর্দার উপর এ প্রতিবিম্বকে ফেলা যায় না। আর জিনিসটা যত বড়, প্রতিবিম্বটা ঠিক তত বড় দেখায়, শুধু পাশাপাশি উল্টে যায়। আর আয়নার সামনে জিনিসটা যত দূরে রয়েছে, আয়নার পিছনে ঠিক তত দূরে প্রতিবিম্বটাকে দেখা যাবে। অবতল দর্পণে কিন্তু প্রতিবিম্ব কোথায় হবে, কি রকমের হবে, তা নির্ভর করবে ওই জিনিসটা আয়না থেকে কত দূরে রয়েছে তার উপর।

অবতল দর্পণের বহু দূরে আলোকিত বস্তু থাকলে তার প্রতিবিম্ব ওই দর্পণের প্রধান ফোকসে হবে, একথা আগে বলা হয়েছে।

এ প্রতিবিম্বকে পর্দার উপর ফেলা যায়, তবে প্রতিবিম্বটা এক্ষেত্রে হবে খুবই ছোট। এবার ওই বস্তুকে অবতল দর্পণের কাছে আনা হতে থাকল। এখনও প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা চলবে, তবে প্রতিবিম্বটা এখনও ছোট থাকবে, আর ওটা উল্টে যাবে, উপরটা নিচে যাবে, নিচেটা উপরে আসবে। কাছে আনতে আনতে এক জায়গায় পৌঁছলে প্রতিবিম্ব ওই আগের মতোই হবে, তবে এখন তার আয়তন ওই বস্তুর সমান হবে।



চিত্র—13
প্রতিবিম্ব পর্দার উপরে পড়েছে, বড় হয়েছে, উল্টে গেছে

আরও কাছে আনলে প্রতিবিম্ব বস্তুর চেয়ে দূরে গিয়ে পড়বে, আর তার আয়তন হবে বড়, তবে এখনও প্রতিবিম্ব উল্টে থাকবে, আর এখনও তাকে পর্দার উপর ফেলা চলবে। এইবার ওই অবতল দর্পণের প্রধান ফোকসে বস্তুটি এসে পৌঁছল, এখন আর ওর প্রতিবিম্ব হবেই না। আরও কাছে নিয়ে গেলে প্রতিবিম্বের আকৃতি-প্রকৃতি একেবারে বদলে যাবে। এখন প্রতিবিম্ব আর উল্টবে না সোজাসুজি দেখাবে, বস্তুর চেয়ে বড় দেখাবে, তবে এখন আর তাকে পর্দায় ফেলা যাবে না, চোখ শুধু তাকে দেখবে, আর দেখবে দর্পণের পিছনে।

কামাবার জন্যে বাজারে এক রকমের আয়না পাওয়া যায়, তা সামান্য পরিমাণে অবতল। আয়নার কাছে মুখ রাখলে মুখের বড় প্রতিবিম্ব দেখা যায়, আর এ প্রতিবিম্ব সোজাই থাকে, উল্টে যায় না।

এখন দেখা যাক, উত্তল দর্পণে কি রকম প্রতিবিম্ব হবে। এখানে

প্রতিবিম্ব সব সময় আয়তনে ছোট হবে, সোজা থাকবে, আর তাকে কখনও পর্দায় ফেলা চলবে না।

সমতল, অবতল ও উত্তল দর্পণে যে-যে রকমের প্রতিবিম্ব হয়, এখন আমরা তাদের তুলনা করি।

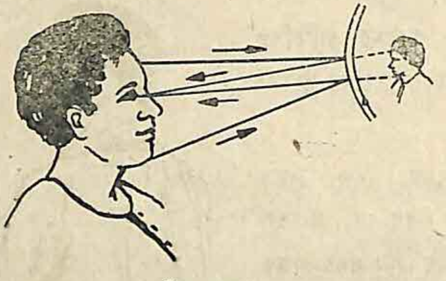


চিত্র—14
প্রতিবিম্ব উল্টায় নি, সোজা আছে, বড় দেখাচ্ছে কিন্তু পর্দায় ফেলা যাবে না

আয়তনের দিক দিয়ে আমরা লক্ষ্য করব যে, সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব সব সময় বস্তুর সমান হবে, ছোট-বড় কখন হবে না, তা বস্তুটি যেখানেই থাকুক। উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব সব সময় ছোট হবে, এর কখন ব্যতিক্রম হবে না। আর অবতল দর্পণে প্রতিবিম্ব ছোটও হতে পারে, বড়ও হতে পারে, সমানও থাকতে পারে,—বস্তুটি কোথায় আছে তার উপর নির্ভর করবে। তারপর, সমতল বা উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব কখনই পর্দায় ফেলা চলবে না, অবতল দর্পণে তা ফেলা চলবে, যদি আলোকিত বস্তু দর্পণের প্রধান ফোকসের ওধারে থাকে। কিন্তু প্রতিবিম্ব পর্দায় যখনই পড়বে তখনই উল্টে যাবে।

সাধারণ আয়না হিসাবে আমরা সমতল দর্পণ ব্যবহার করি। তবে আগে বলা হয়েছে, কামাবার জন্যে আমরা অবতল দর্পণও ব্যবহার করে থাকি। মোটর গাড়িতে ড্রাইভারের কাছে যে দর্পণ লাগান হয়, তা উত্তল। এতে প্রতিবিম্ব ছোট হয়, তাই পিছনের অনেকখানি জায়গার প্রতিবিম্ব একসঙ্গে দেখা যায়, আর প্রতিবিম্ব সোজা থাকে, উল্টে যায় না। রঙ্গমঞ্চে সময় সময় অভিনেতাদের মুখের উপর জোর আলো ফেলা হয়। অবতল দর্পণের প্রধান ফোকসে কোন দীপ ধরলে আলো দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে সমান্তরালে অনেক দূর অবধি যায়। স্টীমার থেকে অনুসন্ধানী আলোও এই ভাবেই ফেলা হয়।

ডাক্তারেরা চোখ পরীক্ষার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাতে একটা ছোট অবতল দর্পণ থাকে। এই দর্পণ দিয়ে বাইরে থেকে আলো



চিত্র—15
উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব সব সময় ছোট হবে, সোজা থাকবে
কিন্তু এখানেও পর্দায় ফেলা যাবে না

চোখের মধ্যে ফেলা হয়, আর ডাক্তার এই আয়নার মধ্যের একটা ফুটো দিয়ে চোখের অবস্থা দেখেন।

উত্তল বা অবতল দর্পণ যথাযথ ব্যবহার করে লোকে কত রকম ধাঁধার সৃষ্টি করে। দোতলায় হোটেল, এক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, আর এক সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। দুই সিঁড়িতেই দর্পণ ঝুলছে। উঠবার সময় লোক দেখে তার মুখখানা খুব রোগা। তারপর খেয়ে-দেয়ে নামবার সময় দেখে এখন মুখখানা খুব ফুলে গিয়েছে, সে দারুণ মোটা হয়েছে। আসলে কিন্তু উঠবার পথে রাখা হয়েছে উত্তল দর্পণ, আর নামবার পথে অবতল দর্পণ।

অনেক মেলায়, আমোদ-প্রমোদের জায়গায়, এমন সব দর্পণ থাকে যাতে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখলে হেসে কুটোকুটি হতে হয়। মনে করা যাক, একটা দর্পণ আছে, যেটা গেলাসের আকারের। পাশাপাশি ভাবে এটা উত্তল দর্পণের মতো, কিন্তু উপর-নিচে এটা সমতল দর্পণের ন্যায়। দু-এর মিলনে মুখের একটা বিকট প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

প্রতিসরণ

আলোকের রশ্মি বায়ুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা আয়নায় পড়ল, সেখানে ধাক্কা খেয়ে আবার বায়ুতে ফিরল, তবে যে-দিক দিয়ে এসেছিল

সে-দিকে নয়, অন্য এক দিকে। এই হল প্রতিফলন। কিন্তু মনে করা যাক, ওই রশ্মি বায়ুর মধ্যে দিয়ে এসে পড়ল জলের উপর বা কাচের উপর। কিছুটা অবশ্য আগের মতো প্রতিফলিত হবে, কিন্তু খানিকটা ওই জল বা কাচের মধ্যে ঢুকে তারই মধ্যে দিয়ে চলবে। এই হল প্রতিসরণ। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে-আলো পড়ছে, তার কিছু অংশ ওই জিনিস শুষে নেবে।

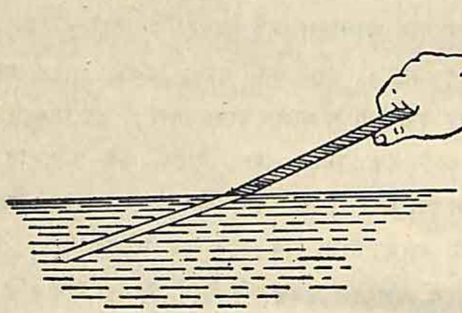
এখন আলোর রশ্মি জল বা কাচ বা অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে ঢুকে আগে যে-পথ ধরে আসছিল সেই পথেই কি চলবে? না, তা চলবে না, বেঁকে অন্য পথ নেবে। মনে করা যাক, একটা পাত্রে জল আছে। জল স্বচ্ছ, আলোর কতক অংশ জলের মধ্যে ঢুকল। যে বিন্দুতে ওই রশ্মি পড়ল, সেখানে একটা লম্ব টানলে দেখা যাবে, ওই আলোর রশ্মি ওই লম্বের দিকে হেলে চলছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে লম্বের দিকে হেলবে তা নয়। এখানে আলো হাল্কা বায়ু থেকে ঘন জলের মধ্যে গেল, এরূপ অবস্থায় লম্বের দিকে হেলবে। কিন্তু যদি উল্টোটা হয়, যদি রশ্মি ঘন জিনিস থেকে হাল্কা জিনিসে চলে, তাহলে ওই রশ্মি লম্ব থেকে দূরে হেলবে। যেমন ধরা যাক, জলের তলায় একটা টাকা রয়েছে। টাকা থেকে আলোর রশ্মি জলের মধ্যে দিয়ে চলে বায়ুস্তরে এসে পৌছল। এখানে রশ্মি ঘন পদার্থ থেকে হাল্কা পদার্থের স্তরে এল। এখানে লম্ব টানলে বায়ুর মধ্যে ওই রশ্মি লম্ব থেকে দূরে হেলে চলবে। এখন এই রশ্মি আমার চোখে এসে ঢুকল, যেদিক ধরে রশ্মি এল সেই দিকেই আমি টাকাটাকে দেখব।

একটা সহজ পরীক্ষায় ব্যাপারটা বেশ বুঝা যায়। টেবিলের উপর একটা বাটি আছে, বাটির তলায় একটা টাকা রয়েছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে বাটির মধ্যে টাকাটা দেখছি। এবার ক্রমশ পিছু হঠতে থাকলুম, টাকাটা দেখা যাচ্ছে—দেখা যাচ্ছে, আরও পিছু হঠছি। ব্যস, আর টাকাটা দেখা যায় না, বাটির কানায় আড়াল পড়ে গিয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে গেলুম। তখন একজনকে বললুম বাটিতে জল ঢালতে। বাটিতে যেই খানিক জল দেওয়া হল, অমনি টাকাটা দেখা গেল।

চৌবাচ্চা যখন জলে ভরতি থাকে, তখন পাশে দাঁড়ালে দেখা যাবে চৌবাচ্চার তলাটা বেশ খানিকটা উচুতে উঠে গিয়েছে।

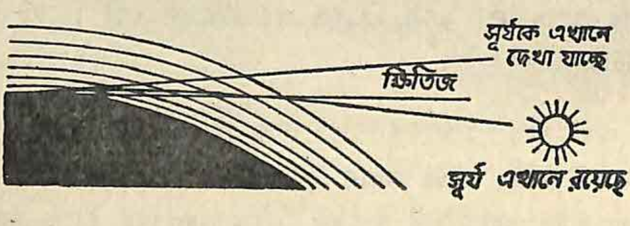
একটা মাছ জলের মধ্যে খেলা করছে। পুকুরের ধার থেকে ওই মাছকে দেখছি। যেখানে দেখছি, আসলে মাছটা কিন্তু তার কিছু নিচুতে আছে।

একটা লাঠির খানিকটা যদি জলের মধ্যে থাকে, তবে লাঠিটা জলের উপর তলে দুমড়ে গেছে বলে মনে হবে। কারণ একই।



চিত্র—16
লাঠিটা দুমড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে

পৃথিবীর উপরে বায়ুমণ্ডল রয়েছে। যত উপরে যাওয়া যাবে, বায়ু তত হাল্কা হবে। কাজে-কাজেই সূর্য থেকে যে রশ্মি আসছে, তা ক্রমশ



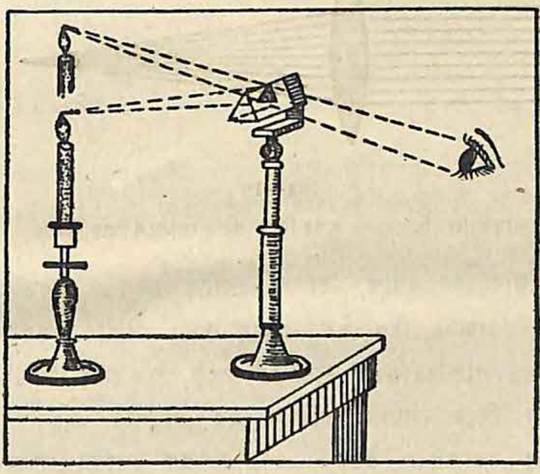
চিত্র—17
সূর্যকে যখন ঠিক ক্ষিতিজের উপরে দেখি তখন সূর্য ঠিক ক্ষিতিজের নিচে রয়েছে

অল্প-ঘন থেকে বেশি-ঘন স্তরে ঢুকছে, ফলে প্রতি স্তরেই ওই রশ্মি একটু একটু বেঁকে চলবে। অবশ্য বায়ুর ঘনত্বের পার্থক্য খুব কম বলে বাঁকাটা খুব কম হবে। শেষ অবধি ওই রশ্মি যেদিক ধরে চোখে এসে

পৌঁছল, সেই দিকেই আমরা সূর্যকে দেখি, তার আসল জায়গায় তাকে দেখিনে। তফাৎটা কি ধরনের হবে, তা এই থেকে বোঝা যাবে যে, সূর্যকে যখন ঠিক ক্ষিতিজের উপরে দেখি তখন ওই সূর্য ঠিক ক্ষিতিজের নিচে রয়েছে।

প্রিজ্‌ম

ঝাড়-লণ্ঠন থেকে যে সব তেশিরা কাচ ঝোলে সেই রকম তেশিরা কাচকে প্রিজ্‌ম বলা হয়। একখানা প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে যদি বাইরের



চিত্র—18

বাতিটা উপরে উঠে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে

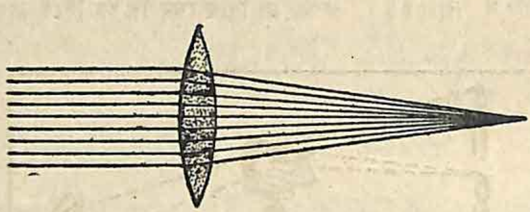
কোন জিনিস দেখি, তবে সেই জিনিসকে তার নিজ স্থানে দেখব না। প্রতিসরণের নিয়ম খাটালে সহজেই এটা বোঝা যাবে। প্রিজ্‌মের শির যদি উপর দিকে থাকে, তবে বাইরের জিনিস উপরে উঠে গেছে বলে মনে হবে।

লেন্স

লেন্স হল একটি স্বচ্ছ জিনিস, সাধারণতঃ কাচের, এর দু-দিকের তল গোলাকার, অন্তত একদিকের তল গোলাকার, আর অপর দিক সমতল।

লেন্স দু-রকমের হয়। এক রকম, যার মাঝখানটা মোটা, চারপাশ ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে; আর এক রকম, যার মাঝখানটা সরু, চারপাশ মোটা হয়ে উঠেছে। প্রথম ধরনের লেন্সকে বলা হয় উত্তল লেন্স, দ্বিতীয় রকমের লেন্সকে বলা হয় অবতল লেন্স।

দর্পণের কথায় আসা যাক। একখানি অবতল দর্পণের উপর যদি সমান্তরাল রশ্মি পড়ে, তবে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি এক জায়গায় এসে মেলে। এটা হল ওই দর্পণের প্রধান ফোকস। প্রধান ফোকসে



চিত্র—19

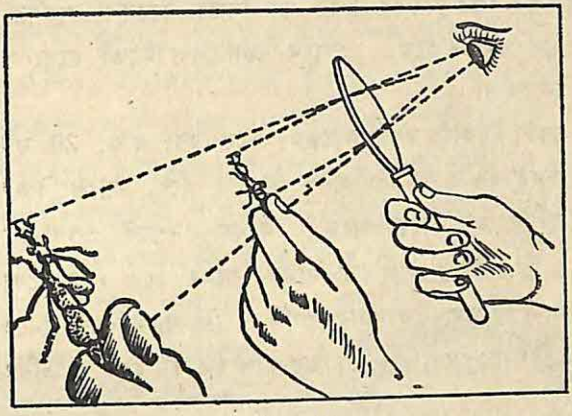
সামন্তরাল রশ্মি লেন্সের অপর দিকে প্রধান ফোকসে গিয়ে মিলছে

আলোর জোর খুব বেশি, তাপও এখানে প্রবল। অবতল দর্পণে যা হয়, উত্তল লেন্স-এ ঠিক সেই রকমই হয়। অর্থাৎ একখানি উত্তল লেন্সের উপর যদি সমান্তরাল রশ্মি এসে পড়ে, তবে সেই রশ্মিগুলি লেন্সের মধ্যে দিয়ে গিয়ে লেন্সের ওদিকে এক জায়গায় মেলে। এটা হল লেন্সের প্রধান ফোকস। তফাৎটা এই, অবতল দর্পণের প্রধান ফোকস হয় যে-দিকে আলো রয়েছে সেই দিকে, আর উত্তল লেন্সে তার বিপরীত দিকে।

অবতল বা উত্তল দর্পণের সামনে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে আলোকিত বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় কোথায় হয় দেখা গিয়েছে। উত্তল বা অবতল লেন্সের সামনে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আলোকিত বস্তু ধরলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে এখন দেখা যাক।

একটি উত্তল লেন্সের সামনে, লেন্স থেকে অনেক দূরে, একটি আলোকিত বস্তু রয়েছে। ওই লেন্সের অপর দিকে ওই বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়বে, প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যাবে, ওর আয়তন ছোট হবে, আর প্রতিবিম্বটা উল্টে যাবে। আলোকিত বস্তু কাছে আনা হতে থাকল।

একটা জায়গায় আনলে প্রতিবিম্বের আয়তন, আলোকিত বস্তুর সমান হবে। আরও কাছে আনা হল। এখন প্রতিবিম্ব বড় হতে থাকবে,



চিত্র—20

প্রধান ফোকসের কাছে ধরাতে প্রতিবিম্ব বড় দেখাচ্ছে, সোজাসুজি দেখাচ্ছে, এ প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যাবে না।

আর এখনও অবধি প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যাবে, আর এখনও প্রতিবিম্ব উল্টবে। কিন্তু এদিকের প্রধান ফোকস যত দূরে তারও কাছে যখন আনা হল, তখন প্রতিবিম্বের আকৃতি-প্রকৃতি একেবারে বদলে যাবে। এখন আলোকিত বস্তু যে-দিকে প্রতিবিম্ব সেই দিকেই হবে। এ প্রতিবিম্বকে আর পর্দায় ফেলা যাবে না, কাজেকাজেই লেন্সের অপর দিক থেকে একে দেখতে হবে, প্রতিবিম্ব বড় দেখাবে, আর তা সোজাসুজিই দেখাবে, উল্টবে না।

অবতল লেন্সের সামনে আলোকিত বস্তু রাখলে যে প্রতিবিম্ব হবে, তা যে-দিকে বস্তু রয়েছে সব সময় সেই দিকেই হবে, তাকে পর্দায় ফেলা যাবে না, প্রতিবিম্ব সব সময় ছোট হবে, আর তা উল্টবে না, সোজা থাকবে।

উত্তল লেন্স আর অবতল লেন্সের জন্য যে-প্রতিবিম্ব হয়, তাদের তুলনা করা যাক। আকৃতির দিক দিয়ে আমরা দেখব যে, অবতল লেন্স দিয়ে যে-প্রতিবিম্ব হচ্ছে তা সব সময় ছোট, উত্তল লেন্সের জন্য প্রতিবিম্ব বড় হয়, সমান হয়, ছোটও হয়। আর প্রকৃতির দিক দিয়ে দেখি, অবতল

লেন্সের জন্য যে-প্রতিবিম্ব হয়, তা কোন ক্ষেত্রেই পর্দার ফেলা যায় না, উত্তল লেন্সের জন্য প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলা যায়—আবার না-ও যায়, আলোকিত বস্তুর দূরত্বের উপর তা নির্ভর করবে। পর্দার উপর একটা প্রতিবিম্ব ফেলতে হবে। এখানে উত্তল লেন্স নিতেই হবে, অবতল লেন্স নিলে চলবে না।

আর একটা দরকারি কথা আছে। মনে করা যাক, 20 ফুট দূরে দেওয়ালের উপর একটা বড় প্রতিবিম্ব ফেলতে হবে, আলোকিত বস্তুটি ঘরের অপর দেওয়ালের কাছে আছে। আমরা নিশ্চয়ই একখানা উত্তল লেন্স নেব। কিন্তু উত্তল লেন্স তো অনেক রকমের হতে পারে, কোনটার প্রধান ফোকস-দূরত্ব কম, কোনটার বেশি। কি রকম লেন্স নিলে ছবি বড় হবে? হিসাবে দেখা যায়, ফোকস-দূরত্ব যত কম হবে প্রতিবিম্ব তত বড় হবে।

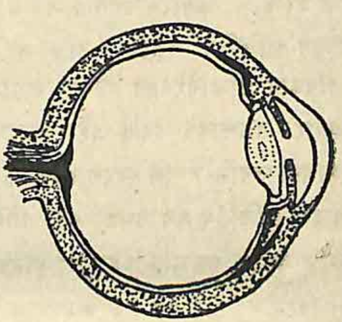
একখানা লেন্স দেওয়া হল। চট করে বলে দিতে হবে ওই লেন্স উত্তল না অবতল। হাত দিয়ে দেখা হল লেন্সের ধারের চেয়ে মাঝখানটা মোটা না সরু। মোটা হলে উত্তল লেন্স, সরু হলে অবতল লেন্স। কিন্তু হাত দিয়ে লেন্সের কাচ কখন ছুঁতে নেই, হাতের ময়লা, তেল কাচের গায়ে লেগে যাবে। অন্য সহজ উপায়ে আমরা বলে দিতে পারি। স্থর্যের আলোতে ধরলে যদি রশ্মিগুলো অন্যদিকে এক-জায়গায় এসে মেলে তবে লেন্সটা উত্তল, যদি না মেলে তবে অবতল। আর লেন্সটা একখানা বই-এর কাছে ধরলে যদি দেখা যায়, লেখাগুলি বড় বড় দেখাচ্ছে, তবে লেন্সটা উত্তল।

আর একটা ব্যাপার আছে। লেন্সটা যত বড় হয়, তার ফাঁদ যত বেশি হয়, প্রতিবিম্ব তত উজ্জল হয়, কারণ অনেকগুলি রশ্মি লেন্সের উপর পড়ে। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে রশ্মিগুলি লেন্স পার হয়ে ঠিক এক জায়গায় মেলে না, প্রতিবিম্ব খুব সুস্পষ্ট হয় না। লেন্সের চারধার মুড়ে দিয়ে যদি শুধু মাঝখানটায় একটা ছোট ফুটো রাখা যায়, তবে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হবে, কিন্তু তাতে আবার জিনিসটার উজ্জলতা কমে যাবে, কারণ এ রকম করলে লেন্সের ভিতর দিয়ে বেশি সংখ্যক রশ্মি তো যাবে না। ক্যামেরায় যাঁরা ছবি তোলেন, তাঁরা এটা দেখেছেন যে, ক্যামেরার মুখটা ছোট করলে ছবি পরিষ্কার হয়।

চোখ

যত রকম আলোক-যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান হল আমাদের চোখ, অথচ মূল্য না দিয়েই একে আমরা পেয়েছি। চোখের একটু-আধটু ত্রুটি আমরা সংশোধন করতে পারি, কিন্তু একটা গোটা চোখ আমরা তৈরি করতে পারি না।

মানুষের চোখ মোটামুটি গোলাকার, দুটো গহ্বরে দুটো চোখ রয়েছে। কতকগুলি পেশী প্রত্যেকটি চোখকে ধরে রয়েছে, সেই পেশীর সাহায্যে আমরা চোখকে খানিকটা এদিক-ওদিক করতে পারি।



চিত্র—21
মানুষের চোখ

চোখের প্রধান অংশ হল একখানা উত্তল লেন্স, স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরি। একটা আবরণ এই লেন্সকে ঢেকে রেখেছে। এই আবরণের মাঝখানে একটি রন্ধ্র আছে, এই রন্ধ্রকে বলা হয় তারা-রন্ধ্র। এই ফুটোটাকে আমরা ইচ্ছামত ছোট-বড় করতে পারি। ছোট করলে আলো কম ঢুকবে, বড় করলে বেশি আলো ঢুকবে। এই হল লেন্সের সামনের দিক। পিছনের দিকে একটা পর্দা আছে, তাকে বলা হয় অক্ষিপট। মস্তিষ্ক থেকে একটা নার্ভ এসে এই অক্ষিপটে ছড়িয়ে পড়েছে। অক্ষিপট ও লেন্সের মাঝের জায়গাটা চট্‌চটে স্বচ্ছ তরল পদার্থ দিয়ে ভরা।

চোখের লেন্স যখন বাইরের কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে ফেলে, তখন ঐ জিনিসটা দেখি। কিন্তু কথা হল এই, এক ফুট দূরের বই-এর লেখাও দেখছি, আবার চোখ ফিরিয়ে একশ গজ দূরে যে তালগাছ রয়েছে তাও দেখছি। একই চোখের পক্ষে দুই দেখা কি করে সম্ভব হচ্ছে? ব্যাপারটা হল এই:

একখানা সাধারণ কাচের লেন্সের দু-দিকের তল যে-রকম বাঁকা তা ঠিকই আছে, তার আর নড়চড় নেই, বক্রতার কম-বেশি হয় না। এই

বক্রতার উপর ওই লেন্সের ফোকস-দূরত্ব নির্ভর করে। সেই জন্য এই কাচের লেন্স থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরে একটা জিনিস ধরলে অপর দিকে অন্য একটা নির্দিষ্ট দূরে তার প্রতিবিম্ব পড়বে, আর ঠিক সেখানে একটা পর্দা ধরলে পর্দার উপর প্রতিবিম্ব ফেলা যাবে। পর্দাকে তার থেকে এদিক-ওদিক করলে প্রতিবিম্ব ঝাপসা অস্পষ্ট হবে। এক ফুট দূরের জিনিসের প্রতিবিম্ব ধরতে পর্দাকে যেখানে রাখতে হবে, একশ গজ দূরে যে-বস্তু রয়েছে তার প্রতিবিম্ব ধরতে পর্দাকে সেখানে রাখলে চলবে না, লেন্সের আর একটু কাছে সরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু চোখের বেলায় কি হচ্ছে ? এখানে লেন্সও সরান যায় না। আর ওই অক্ষিপট, যার উপর প্রতিবিম্ব পড়ছে, তাও সরান যায় না, অথচ কাছের জিনিসের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব ওর উপর পড়ছে, আবার দূরের চন্দ্র-সূর্যও দেখছি। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই : চোখে যে লেন্স রয়েছে সেই লেন্সের বক্রতা আমরা তখনি-তখনি বদলে ফেলতে পারি, আর এমনভাবে বদলাতে পারি যাতে প্রতিবিম্ব সব সময় ওই অক্ষিপটের উপর পড়ে। চেষ্টা করে এ কাজ করতে হয় না, চেষ্টা তো দূরের কথা, এ কাজ যে করছি তা বুঝতেও পারিনে। চোখের এই ক্ষমতাকে উপযোজন বলা হয়।

কিন্তু এই উপযোজন-ক্ষমতার একটা সীমা আছে। বই-এর পাতাটা চোখ থেকে এক-ইঞ্চি দু-ইঞ্চি দূরে রাখলুম। হাজার চেষ্টা করলেও লেখা পড়তে পারব না। মোটামুটি দেখা গিয়েছে, জিনিসটা যদি চোখ থেকে এক ফুটের বেশি দূরে কোথাও থাকে তবে আমরা লেন্সের ফোকস-দূরত্ব বদলে এই জিনিসটাকে পরিষ্কার দেখবার ব্যবস্থা করতে পারি। তবে এক ফুট দূরের জিনিসকে আমরা সবচেয়ে ভাল দেখি।

স্বাভাবিক চোখ উপযোজন-শক্তির বলে এক ফুট থেকে বহু দূর পর্যন্ত যে-জিনিস রয়েছে তাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। কিন্তু যখন চোখে দোষ ধরে, অর্থাৎ এই উপযোজন শক্তি কমে যায়, তখন অন্য লেন্সের সাহায্য নিতে হয়, অর্থাৎ চশমা ব্যবহার করতে হয়। চোখের কি রকম ত্রুটি হয়েছে, তার উপর নির্ভর করবে চশমার লেন্স কি রকমের হবে।

একটি ছাত্রের ডায়রিতে এই রকম লেখা দেখা গেল :

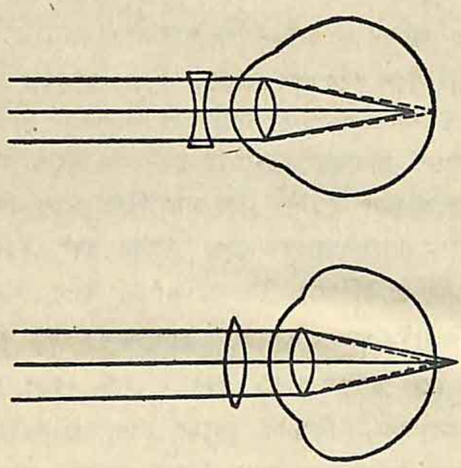
অঙ্কের ক্লাস। সেদিন একটু দেরিতে গিয়েছি, কাজে-কাজেই পিছনের

বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে হল। শিক্ষকমশায় বোর্ডে আঁক কষে যাচ্ছেন, কিন্তু লেখাগুলি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না, ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ঠেকছে। তারপর রোজ তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রথম বেঞ্চিতে বসি, আর যারা শেষ বেঞ্চিতে গিয়ে বসে তাদের জন্য দুঃখ হয়, কারণ নিশ্চয় তারা বোর্ডের লেখা ভাল করে পড়তে পারে না। একদিন তাদের সে কথা বললুম। তারা বললে—কই না, আমরা তো শেষ বেঞ্চিতে বসেও সব বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই। বাড়িতে গিয়ে বাবাকে সব কথা বললুম। পরের দিন বাবা একজন চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি পরীক্ষা করে চশমার ব্যবস্থা করলেন। দু-তিন দিন পরে চশমা এল, সেই চশমা পরে ক্লাসে গেলুম। ইচ্ছে করে শেষ বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। বোর্ডের লেখা এখন বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেদিন কি আনন্দ।

অল্প বয়সে সাধারণত চোখের যে দোষ ধরে, তাতে কাছের জিনিস দেখতেকোনরূপ অসুবিধা হয় না, কিন্তু দূরের জিনিস ঝাপ্‌সা ঠেকে। এখানে চোখের লেন্সের বক্রতা যতদূর বদল করা যায়, করেও দূরের জিনিসের প্রতিবিম্বকে ঠিক অক্ষিপটের উপর ফেলা যাচ্ছে না, প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের সামনে পড়ছে। একে আর একটু দূরে অক্ষিপটের উপর ফেলতে হলে চোখের সামনে একখানি লেন্স ধরতে হবে। চশমায় সেই ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু কি রকমের লেন্স তা করবে? প্রতিবিম্ব যখন আরও দূরে ফেলতে হবে, তখন নিশ্চয় অবতল লেন্স চাই। এখন ওই অবতল লেন্সের ফোকস দূরত্ব কত হবে, তা নির্ভর করবে চোখ কতদূর অবধি অভিযোজন করতে পারবে তার উপর।

এখানে একটা হিসাবের কথা বলা যাচ্ছে। ধরা যাক, 25 সেন্টিমিটার ফোকস-দৈর্ঘ্যের লেন্স লাগল। 25 সেন্টিমিটারকে মিটারে প্রকাশ করা যাক। হল $\frac{1}{4}$ মিটার। সংখ্যাটা উল্টে বসান হল, দাঁড়াল 4। আর লেন্সের পাওয়ার হল 4। আর ডাক্তারেরা উত্তল লেন্সকে ধরেন + (প্লাস), অবতল লেন্সকে ধরেন – (মাইনস)। সুতরাং একজন চিকিৎসক যদি –2 পাওয়ারের চশমা ব্যবস্থা করেন, তবে বুঝতে হবে চশমার লেন্সটা হবে অবতল, আর ওই লেন্সের ফোকস-দূরত্ব হবে $\frac{1}{2}$ মিটার, অর্থাৎ 50 সেন্টিমিটার।

সাধারণত একজন লোক যখন চল্লিশ ছাড়ায়, তখন সে কাছের জিনিস অস্পষ্ট দেখে, কিন্তু দূরের জিনিস দেখবার তার কোন অসুবিধা হয় না। এখানে কাছের জিনিসের প্রতিবিম্ব অক্ষিপট ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ে, চোখ চেষ্টা করে তাকে আরও কাছে অক্ষিপটের উপর ফেলতে পারছে না। চোখের সামনে লেন্স ধরা হল। কিন্তু প্রতিবিম্বকে কাছে আনবে কোন্ লেন্স? নিশ্চয় উত্তল লেন্স। কতদূর থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়, তার থেকে হিসেব করে কি রকম পাওয়ারের উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে ঠিক করা হয়।



চিত্র—22

উপরের চোখে প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের সামনে পড়েছে, চোখ তাকে অক্ষিপটের উপর ফেলতে পারছে না, একখানা অবতল লেন্সের সাহায্য নেওয়া হল। নিচের চোখে প্রতিবিম্ব অক্ষিপট ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ছে, চোখ চেষ্টা করেও তাকে অক্ষিপটের উপর ফেলতে পারছে না, একখানা উত্তল লেন্সের সাহায্য নেওয়া হল।

ধরা যাক, একজন যুবক চোখের দোষের জন্য অবতল লেন্স ব্যবহার করে চলেছে। এখন তার বয়স চল্লিশ হল, তার উত্তল লেন্সের দরকার কাছে পড়বার জন্যে। এখন সে কি করবে? এখন দূরের জিনিস দেখবার জন্যে চশমার উপরটা হবে অবতল লেন্স, আর পড়বার জন্যে চশমার নিচেটায় থাকবে উত্তল লেন্স।

একখানা কাগজে উপর-নিচে, আশেপাশে অনেকগুলি সরল রেখা

টানা আছে। যদি কোন লোক ওই সব সরল রেখার কতকগুলি সুস্পষ্ট আর কতকগুলি অস্পষ্ট দেখে, তবে বুঝতে হবে, বিষম-দৃষ্টি দোষ দেখা দিয়েছে। এই রকম হবার কারণ চোখের লেন্সের বক্রতা সবদিকে সমান নেই; অর্থাৎ চোখের লেন্সের তল ফুটবলের মতো না হয়ে একটা গেলাসের তলের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে যে-লেন্স ব্যবহার করতে হবে, তার তল ওই গেলাসের তলের মতো হবে, তবে হিসেব করে বসাতে হবে।

আচ্ছা, দুটো চোখ থাকার সার্থকতা কি? কেউ হয়তো মনে করবেন, দুটো চোখ থাকায় আমাদের বেশ সুশ্রী দেখায়। কেউ ভাববেন, চোখ দুটো থেকে ভালই হয়েছে, একটা যদি যায় আর একটা রইল। কিন্তু এসব কোন কাজের কথাই নয়। দুটো চোখ থাকায় একটা জিনিস কত দূরে রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা জন্মাচ্ছে।

দুচোখ দিয়ে একটা জিনিসকে দেখতে হলে চোখের পেশীকে চেষ্টা করে প্রত্যেক চোখকে সেই দিকে ফেরাতে হবে। জিনিসটা কাছে থাকলে এক রকম করে ফেরাতে হবে, দূরে থাকলে আর এক রকম করে ফেরাতে হবে। চোখের এই প্রয়াস থেকে জিনিসটা কত দূরে আছে, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়। ধারণাটা অবশ্য অভ্যাসের ফলেই হয়। একটি শিশুকে ঘাঁটালে দেখা যাবে দূরত্ব সম্বন্ধে সে কি রকম মজার মজার ভুল করছে।

পেশীর প্রয়াস থেকে আমরা যে অনেক বিষয়ের ধারণা করি তার একটা উদাহরণ হল, ভার তোলা। একখানা পাথর হাতে করে তুলে আমরা বলে দিলুম, ওর ওজন 5 সের। পেশীর চেষ্টা থেকে আর অভ্যাস-বশত এই ধারণা জন্মায়।

এক চোখ বন্ধ রাখলে আমাদের যে দূরত্ব সম্বন্ধে ভুল হয়, সে বিষয়ে একটা সহজ পরীক্ষা করা যেতে পারে। এক চোখ বন্ধ রেখে ছুঁচের মধ্যে সুতো পরাতে গেলে অনেক বার ঠকতে হবে।

স্টিরিওস্কোপ

প্রতি চোখের জন্য অক্ষিপটে হুবহু একই প্রতিবিম্ব পড়ছে না। শুধু যদি ডান চোখ দিয়ে দেখি তবে জিনিসের ডান দিকটা একটু বেশি দেখব,

বাঁ চোখ দিয়ে দেখলে বাঁ দিকটা একটু বেশি দেখা যাবে। এক সঙ্গে যদি দুচোখ দিয়ে দেখি, তবে ওই অল্প তফাতের দুই ছবিকে চোখ মেলাতে যাবে, আর তার জন্যে যে অনুভূতি হবে তাতে ছবিটাকে শুধু উপর-নিচে ও আশেপাশে বিস্তৃত দেখব না, তার সামনে-পিছনের বিস্তারেরও অনুভূতি হবে। একটা সাধারণ ছবিতে এই সামনে পিছনের বিস্তার দেখা যায় না, কিন্তু এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে সেই রকম বোধও হয়। এই যন্ত্রকে বলা হয় স্টিরিওস্কোপ।

প্রথমত দুটি ক্যামেরা দিয়ে একই জিনিসের দুটি ছবি তোলা হল। আমাদের দুই চোখের মধ্যে যে দূরত্ব, ক্যামেরা-দুটিকে পাশাপাশি ততটা দূরে রেখে ছবি তোলা হল। ছবি দুটি হুবহু এক হল না। এইবার স্টিরিওস্কোপ যন্ত্র নেওয়া হল। এই যন্ত্রে দুটি লেন্স আছে, আমাদের চোখদুটি যত দূরে আছে লেন্সদুটির মধ্যেও দূরত্ব ততটা। যন্ত্রে ছবিদুটিকে দুজায়গায় বসাবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে বসিয়ে লেন্সের মধ্যে দিয়ে ছবিদুটিকে দেখা হল। এখন মনে হবে ছবির দৃশ্যটি চেপ্টা নয়, সামনে-পিছনেও ওই দৃশ্যের বিস্তৃতি আছে।

বায়োস্কোপ

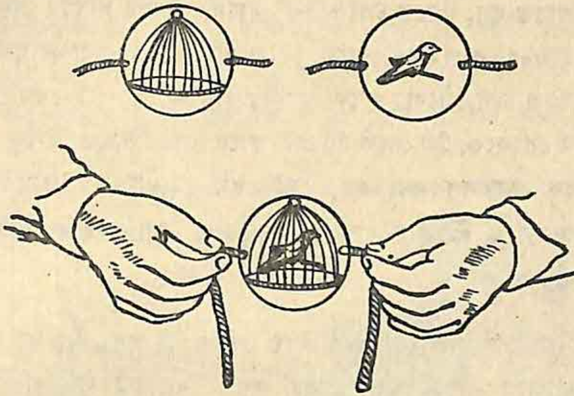
জোর বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টির এক একটা রেখা সোজা নেমে নেমে আসছে। কিন্তু আসলে বৃষ্টি তো ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে।

জ্বলন্ত একটা মশালকে খুব জোরে ঘোরান হচ্ছে। সেই মশালকে আলোর একটা চাকার মতো দেখাচ্ছে। একটা কার্ডবোর্ডের একদিকে একটা পাখি, অন্যদিকে একটা শূন্য খাঁচা আঁকা হল। কার্ড বোর্ডের দুদিকে দুটো সুতো বেঁধে সুতোদুটো টান টান করে ধরে কার্ডবোর্ডটাকে ঘোরান হতে লাগল। দেখব, খাঁচার মধ্যে পাখিটা বসে রয়েছে।

কিন্তু চোখ এ রকমের ভুল করে কেন ? চোখ একটা জিনিস দেখল, অক্ষিপটে সেই জিনিসের প্রতিবিম্ব পড়ল, মস্তিষ্কে সেই জিনিসের একটা অনুভূতি হল। এইবার জিনিসটা সরিয়ে নেওয়া হল, প্রতিবিম্ব চলে গেল ; কিন্তু ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি চলে গেল না, অনুভূতিটা আরও কিছুক্ষণ থেকে যায়, সেকেণ্ডের প্রায় দশ-ভাগের এক-ভাগ সময় পর্যন্ত থাকে।

একটা আলোর দিকে তাকিয়ে আছি। একজন এসে আড়াল করে দাঁড়াল। আলো আর দেখছি না। লোকটা সরে গেল, আবার আলো

দেখলুম। সে যদি খুব চট্‌পট যাওয়া-আসা করে, তবে আলো দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না, এ বোধ আর থাকবে না, আলোটা স্থির ভাবে



চিত্র—23

কার্ডবোর্ডে একদিকে আঁকা শূন্য খাঁচা, অন্যদিকে পাখি, কিন্তু বোর্ডটা ঘোরালে মনে হবে পাখি খাঁচার ভিতর রয়েছে

দেখা যাবে। তবে যাওয়া-আসাটা খুব তাড়াতাড়ি হওয়া চাই, সেকেণ্ডে দশ-ভাগের চেয়েও কম হওয়া দরকার।

একটা লোক দু-হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এই ছবি তোলা হল। তারপর সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে, তারপর আরও একটু বেশি ঝুঁকেছে, আরও একটু বেশি, তারপর হাতদুটো মাটির উপর ভর করে পা-দুটো উপর তুলে আছে, এই রকম পর পর গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে,—এই রকমের ছবি যদি খুব চট্‌পট চোখের সামনে ধরা যায়, তা হলে আমরা কি দেখব? দেখব, একটা লোক ডিগবাজি খাচ্ছে। চোখের এ একটা ত্রুটি বলতে হবে, কারণ চোখ তো সঠিক জিনিসটা দেখছে না। কিন্তু এই ত্রুটির সুবিধা নিয়ে মানুষ নিজেকেই ঠকাল, অবশ্য তাতে আমোদ পেল, তৈরি হল বায়োস্কোপ। মানুষ ছবিতে দেখছে (দেখছে বলে মনে করছে), জল পড়ছে, পাতা নড়ছে, মানুষ চলছে, ঘোড়া দৌড়চ্ছে।

বায়োস্কোপে দুটো ব্যাপার আছে, প্রথম ছবি তোলা, তারপর সেই ছবিকে পর্দায় ফেলা। বিশেষ রকমের একটা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা

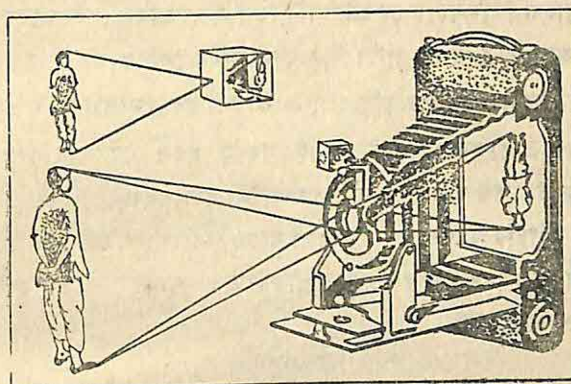
হয়। ক্যামেরায় খুব লম্বা একটা ফিল্ম পরান থাকে, আর ফিল্মটাকে টেনে নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়। ক্যামেরার লেন্সের মুখ বন্ধ, ফিল্ম চলতে আরম্ভ হল, চলতে চলতে একটু থামে, খুব অল্প সময়ের জন্য থামে, ঠিক সেই সময় লেন্সের মুখ খোলে, ফিল্মে ছবি ওঠে। লেন্সের মুখ তখনই বন্ধ হয় ফিল্ম চলে, আবার থামে, আবার ছবি ওঠে। এই রকম সেকেণ্ডে, মাত্র এক সেকেণ্ডে, 20 থেকে 50 এই হারে ছবি উঠতে থাকে। এখন ফিল্মটাকে ডেভেলপ করা হল, সেটা হল নেগেটিভ। তারপর সেই নেগেটিভ থেকে পজেটিভ তোলা হল। এ ব্যাপারগুলি কি, পরে বলা হবে।

এইবার জোর আলো দিয়ে ফিল্মে তোলা ওই সব ছবির বড় প্রতিবিম্ব খুব তাড়াতাড়ি পর্দায় ফেলে যাওয়া হল। ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে পর্দায় ছবি ফেলা যায়, কি করে, আমরা পরে দেখছি। বায়োস্কোপে ছবি ফেলবার যন্ত্র অনেকটা ম্যাজিক লণ্ঠনের মতোই, তবে এতে অন্য কিছু ব্যবস্থাও আছে। প্রথম, ফিল্মটাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হবে, এর একটা ব্যবস্থা থাকে। গোড়ায় লেন্সের মুখটি বন্ধ। ফিল্মটি চলতে চলতে মুহূর্তের জন্য থামল, আর ঠিক যেই থামল, অমনি অল্প সময়ের জন্য লেন্সের মুখ খুলল। ফিল্মের ছবির একটা বড় প্রতিবিম্ব পর্দার উপর পড়ল। তখনি লেন্সটি বন্ধ হল, ফিল্ম চলল। এই রকম ছবি যেই লেন্সের সামনে আসে, ফিল্ম স্থির হয়, লেন্সের মুখ খুলে যায়, পর্দায় ছবির প্রতিবিম্ব পড়ে। যে হারে ছবি তোলা হয়েছিল, পর্দার উপর সেই হারে ছবি ফেলা হয়। এই হার হল সেকেণ্ডের দশ-ভাগের এক-ভাগ সময় বা তার চেয়েও কম, কাজে-কাজেই যে চলন্ত দৃশ্যের ছবি তোলা হয়েছিল, সেই চলন্ত দৃশ্যেরই অনুভূতি হয়।

ক্যামেরা

ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হয়। একটা ক্যামেরার প্রধান অংশ হল একখানা লেন্স। একটা কাল বাক্সের একদিকে এটা লাগান আছে। এর ঠিক বিপরীত দিকে একখানা ঘষা কাচ আছে। একটা স্ক্রু ঘুরিয়ে লেন্সটাকে সামনে-পিছনে করা যায়। এই রকম করে যে জিনিসের ছবি

তুলতে হবে, তার একটা সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব ওই ঘষা কাচের উপর ফেলা হয়। একে বলা হয় ফোকস করা। প্রতিবিম্বটা উল্টো হবে। এইবার ঘষা কাচখানা সরিয়ে একখানা ফটোগ্রাফের প্লেট বা একটা ফিল্ম পরান হল। এই প্লেট বা ফিল্মের গায়ে এমন একটা রাসায়নিক জিনিস লাগান আছে, যার উপর আলোর ক্রিয়া হয়। ঘষা কাচ সরাবার আগে লেন্সের



চিত্র—24

উপরের ক্যামেরায় কোন লেন্স নেই, একটা অনচ্ছ পদার্থে একটা
ছোট ফুটো আছে, উল্টো প্রতিবিম্ব পড়েছে।
নিচে লেন্সযুক্ত ক্যামেরা

মুখ বন্ধ রাখা হয়েছিল। লেন্সের মুখটা ইচ্ছামত বাড়ান কমান যায়। বাইরে আলোর জোর থাকলে লেন্সের মুখটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এইবার লেন্সের মুখটা একবার খুলেই বন্ধ করে দেওয়া হল। কতক্ষণ সময় খুলে রাখতে হবে, তা নির্ভর করবে ওই ফিল্ম বা প্লেট কি রকমের তার উপর, বাইরের আলোর জোর কি রকম তার উপর, লেন্সের মুখটা কতটা খোলা আছে তার উপর। ব্যাপারটা নির্ভর করে অভিজ্ঞতার উপর, আর এর জন্য ছবি অনেকটা ভাল-মন্দ হয়।

যে জিনিসের ফটো নেওয়া হচ্ছিল, ফিল্মে তার যে-যে জায়গা থেকে আলো আসছিল, সেই মতো জায়গায় ফিল্মে বা প্লেটে রাসায়নিক ক্রিয়া হল, আর যে-যে জায়গা থেকে আলো আসছিল না সেই অনুযায়ী জায়গা

ঠিক রইল। এইবার একটা অন্ধকার ঘরে, বা শুধু লাল আলোজ্বালা ঘরে, ওই প্লেট বা ফিল্ম বের করে ওর উপর কয়েকটা রাসায়নিক দ্রব্য ঢেলে দেওয়া হল। এতে যেখানে যেখানে আলো এসে পড়ছিল, সেই সেই জায়গা কাল হয়ে যাবে। আর যে-সব জায়গায় আলো পড়েনি, সেই সেই জায়গায় যে রাসায়নিক দ্রব্য মাখান ছিল তা উঠে যাবে। ফলে ফিল্ম বা প্লেটের উপর এমন একটা ছবি হবে, যাতে জিনিসটার আলো আঁধার উল্টে যাবে, জিনিসটার যে জায়গাটা ছিল সাদা ছবির সেই জায়গাটা হবে কাল, আর তার যে জায়গাটা ছিল কাল ছবির সেই জায়গাটা হবে সাদা। এই যে বিপরীত রকমের ছবি হল, একে বলা হয় নেগেটিভ। এইবার এর পজিটিভ তোলা হল। সেটাও এই রকমে হয়ঃ ওই নেগেটিভের উপর আর একটা ফিল্ম বসিয়ে তার উপর আলো ফেলা হল। এখন নেগেটিভের আলো-আঁধার উল্টে গেল। দেখা যাচ্ছে, আলো-আঁধার দুবার উল্টাল, একবার নেগেটিভে, আর একবার পজিটিভে। দুবার উল্টানর ফলে ছবিটা ঠিক মত উঠল।

মানুষের চোখ ও ক্যামেরা এ দু-এর গঠন প্রায় একই রকমের। মানুষের চোখ যে কোটরের মধ্যে রয়েছে, তার ভিতরে সামনের লেন্স ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে বাইরে থেকে আলো ঢুকতে পারে না। ক্যামেরাতেও ওই রকম ব্যবস্থা আছে। চোখে একটা উত্তল লেন্স আছে, ক্যামেরাতেও ওই রকম লেন্স আছে। লেন্স দিয়ে বাইরের জিনিসের প্রতিবিম্ব পড়বার জন্যে চোখে একটা অক্ষিপট আছে, ক্যামেরাতে সেই রকম একটা প্লেট বা একটা ফিল্ম দিতে হয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে এ দু-এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। চোখের অক্ষিপটে প্রতিবিম্ব ফেলতে আমরা লেন্সের বক্রতা প্রয়োজন মতো বদলাই, লেন্স যথাস্থানে থাকে। ক্যামেরার লেন্স তো কাচের, তার তলের বক্রতা তো বদলান যায় না, সমস্ত লেন্সখানাকে এদিক-ওদিক সরিয়ে প্লেট বা ফিল্মের উপর প্রতিবিম্ব ফেলি। চোখের পাতা চোখের মধ্যে আলো আসা না-আসা ঠিক করে, আর চোখের তারারন্ধ্র নিজেকে ছোট-বড় করে কম আলো বা বেশি আলো আনে। ক্যামেরাও ঠিক সেই রকমের ব্যবস্থা আছে।

ম্যাজিক লণ্ঠন

ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে কাচের উপরে বা ফিল্মের উপরে তোলা ছোট ছবিকে বড় করে পর্দার উপর ফেলা যায়।

ম্যাজিক লণ্ঠন যন্ত্রের প্রধান অংশ হল একটা উত্তল লেন্স। লেন্সের একদিকে ফিল্ম বা ফটোগ্রাফি কাচ ধরা হয়, আর তার উপর জোর আলো ফেলা হয়। তারপর ফিল্ম আর লেন্সের মধ্যে দূরত্ব বদলান হয়, যাতে করে পর্দার উপর একটা বড় প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু এ প্রতিবিম্ব তো উল্টো হবে! যাতে সোজাসুজি দেখায় সেজন্য ওই কাচ বা ফিল্মকেই উল্টো করে ধরা হয়। ফিল্ম বা কাচের উপর জোর আলো ফেলবার একটা বন্দোবস্ত আছে। এজন্য জোরাল বৈদ্যুতিক আলো নেওয়া হয়, আর একখানা বড় উত্তল লেন্স দিয়ে সেই আলোকে লেন্স বা ফিল্মের উপর সংহত করা হয়।

অণুবীক্ষণ

অণুবীক্ষণ মানুষের দৃষ্টিকে এক অদৃশ্য লোকে নিয়ে গিয়েছে, যেলোকের পরিচয় সে খালি চোখে পায়নি। আজকালকার চিকিৎসাবিদ্যার মূলে আছে জীবাণু আবিষ্কার, আর জীবাণু-আবিষ্কার সম্ভব হল অণুবীক্ষণের সাহায্যে। অণুবীক্ষণ প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

জল-বোঝাই একটা গোল কাচের পাত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে অন্য দিকের জিনিস বড় দেখায়, বহু যুগ আগে থেকে মানুষ এটা লক্ষ্য করেছে। প্রাচীন যুগে মণিরত্ন প্রভৃতিতে যারা সূক্ষ্ম খোদাই কাজ করত, তারাও সম্ভবত পদার্থকে বড় করে দেখবার একটা ব্যবস্থা করেছিল। চশমা যারা তৈরি করেছে, তারা নিশ্চয়ই জেনেছে যে, লেন্স দিয়ে পদার্থকে বড় করে দেখা যায়।

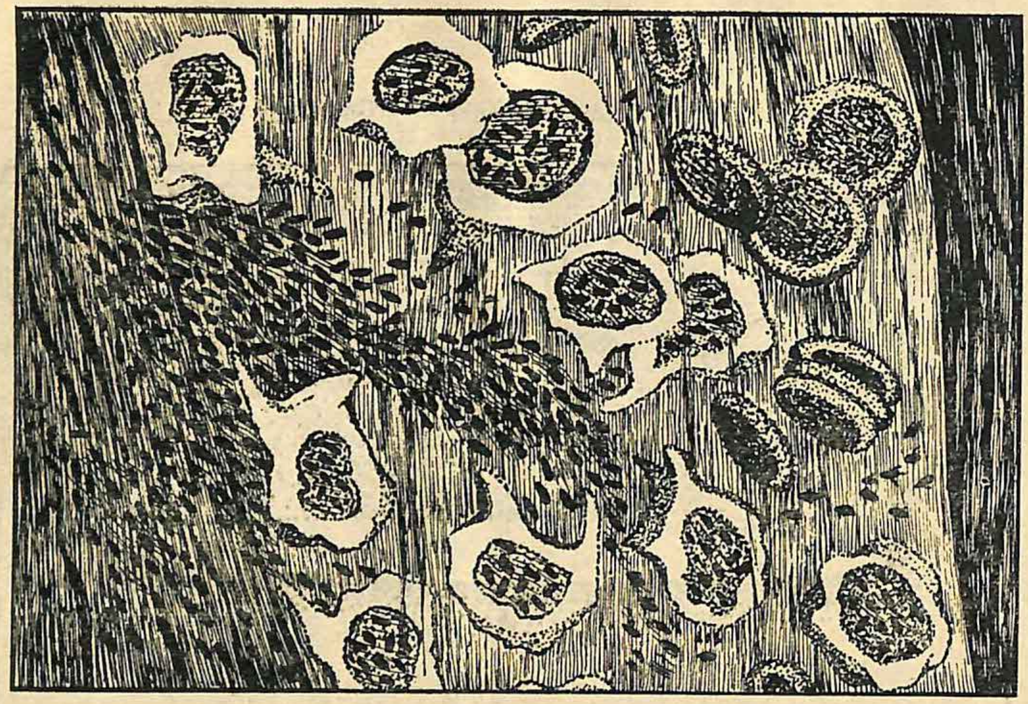
প্রায় তিন শ বছর আগেকার কথা। যারা চশমা তৈরি করত, তাদের কাছে গিয়ে লিউএনহুক নামে এক ভদ্রলোক কাচ ঘষে লেন্স তৈরি করবার

কৌশল শিখলেন। আর শেষ অবধি তিনি এমন একখানা লেন্স তৈরি করলেন, যা দিয়ে একটা পদার্থের ব্যাস প্রায় দেড়শ গুণ বড় দেখায়। লিউএনহুক তাঁর এই লেন্স দিয়ে সর্বপ্রথম জীবাণু আবিষ্কার করলেন, যে-জীবাণুকে এর আগে মানুষ খালি চোখে দেখতে পায়নি।

একটা উত্তল লেন্স দিয়ে কোন জিনিসের একটা বড় প্রতিবিম্ব পর্দার উপর ফেলা যায়। কিন্তু এখানে প্রতিবিম্বটি উল্টে যাবে। আমরা যখন ঘড়ির ভিতরকার সূক্ষ্ম কলকব্জা, বই-এর ছোট হরপ ভাল করে দেখতে চাই, তখন পর্দায় ফেলার তো কোন কথা নেই, আমরা চাই চোখ দিয়ে তার একটা সোজা আর বড় প্রতিবিম্ব দেখতে। এই রকমের প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাব যদি পদার্থটিকে ওই উত্তল লেন্স ও তার প্রধান ফোকসের মধ্যে ধরি। কিন্তু এর মধ্যে ঠিক কোন্ জায়গাটায় ধরব? আমরা জানি, একটা জিনিস সবচেয়ে পরিষ্কার দেখাবে যখন ওটা চোখ থেকে প্রায় 25 (cm) সেন্টিমিটার অর্থাৎ 10 ইঞ্চি দূরে থাকে। কাজে-কাজেই ওই ছোট পদার্থটিকে এমন জায়গায় ধরব, যাতে করে প্রতিবিম্বটি পড়ে চোখ থেকে 25 cm. দূরে। পদার্থকে এদিক-ওদিক করে ঠিক সেই জায়গায় পদার্থের প্রতিবিম্বটি আনাকে বলা হয় ফোকস করা।

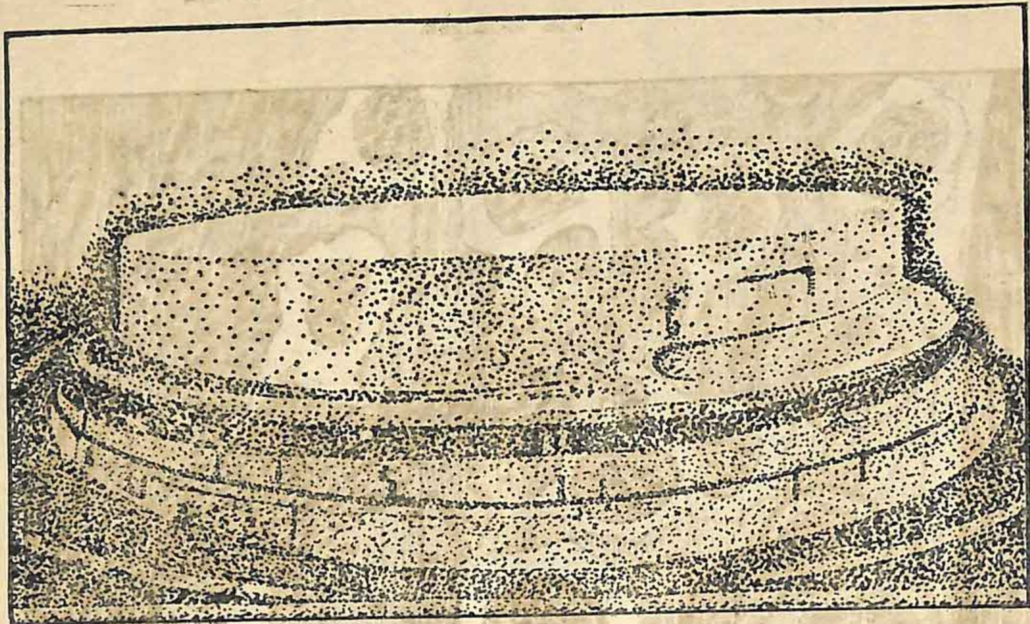
সুতরাং একটি উত্তল লেন্স হল একটি অণুবীক্ষণ। অবশ্য একে ধরবার একটা ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই রকম একখানি লেন্সের অণুবীক্ষণ দিয়ে ছোট জিনিসকে খুব বেশি বড় করা যায় না। বেশি বড় করতে হলে অণুবীক্ষণে পর পর দুখানা লেন্স একটা নির্দিষ্ট দূরে থাকবে, আর সেই দুখানা লেন্সই হবে উত্তল। যে লেন্সটা চোখের কাছে থাকবে তার ফোকস-দৈর্ঘ্য হবে খুব ছোট, অন্যটার বড়। প্রথম লেন্স পদার্থকে একবার বাড়াবে, আর সেই প্রতিবিম্বকে দ্বিতীয় লেন্স আর একবার বাড়াবে। এ হলে জিনিসটা অনেক বেশি বড় দেখাবে। কিন্তু মোট কথা এই হলেও এতে প্রতিবিম্ব বাঁকাচুরা হবে, ধারটা একটু রঙিনও হবে। এ-সব দূর করতে হলে আরও অনেক কিছু করতে হয়। খুব ভাল একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে একটা জিনিসকে প্রায় 1500 গুণ অবধি বড় দেখা যায়।

কিন্তু মানুষ তাতেও খুশি নয়, সে আরও বেশি বড় করে দেখতে



অণুবীক্ষণের জগৎ

টাইফয়েড রোগীর এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে কি কাণ্ড হচ্ছে। টাইফয়েড রোগের কাল রঙের জীবাণুগুলিকে আক্রমণ করছে, তাদের ছিন্নভিন্ন করে ধ্বংস করছে, গিলে ফেলছে!



পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুরবীনের ২০০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দর্পণ

চায়। শেষ অবধি সে তা পারল, তবে আলো ছেড়ে সাহায্য নিল ইলেক্‌ট্রনের। সে কথা এখানে থাক।

দূরবীক্ষণ

আমরা দূরের জিনিসকে কাছে দেখতে চাই, বড় করে দেখতে চাই, খালি চোখে দূরের যে সব জিনিস দেখা যায় না তাদেরও দেখতে চাই। পেলুম দূরবীক্ষণ। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের ইতিহাসটা এই ঃ

হল্যাণ্ডের একজন চশমা-ব্যবসায়ী যখন বাইরে কোন কাজে গিয়েছিলেন, তখন দোকানের একটি ছেলে নানা রকমের লেন্স নাড়াচাড়া করতে করতে দুরকমের দুখানা লেন্স সাজিয়ে দেখল দূরে গির্জার মাথাটা বড় দেখাচ্ছে। মনিব ফিরে এলে ছেলেটি তাঁকে ওটা দেখাল, আর ওই চশমা ব্যবসায়ী একটা দুরবীণ তৈরি করলেন। পৃথিবীতে এই প্রথম দুরবীন তৈরি হল। এ হল 1608 সালের কথা।

গ্যালিলিও এই খবর পেয়ে ওই যন্ত্রের মূল কথাটা অনুসন্ধান করতে লাগলেন, আর এর পরের বছর তিনি এক দুরবীন খাড়া করলেন। ধীরে ধীরে গ্যালিলিও তাঁর যন্ত্রের উন্নতি করতে থাকলেন, দুরবীন দিয়ে তিনি সূর্যের কলঙ্ক দেখলেন, চাঁদে পর্বত দেখলেন, বৃহস্পতির চাঁদ দেখলেন, আকাশে আরও অনেক জিনিস লক্ষ্য করলেন, খালি চোখে যা দেখা যায় না।

আকাশে গ্রহনক্ষত্র দেখবার দুরবীনের প্রধান অংশ হল দুটি উত্তল লেন্স একটি নলের দুদিকে বসান। যে-লেন্স চোখের কাছে সে-লেন্সটি ছোট, আর তার ফোকস-দূরত্বও কম, আর যে-লেন্স নলের অপর দিকে সেটা বড়, আর তার ফোকস-দূরত্বও বেশি। আকাশের কোন একটা নক্ষত্রকে এই দুরবীন দিয়ে দেখছি। ওই জ্যোতিষ্ক থেকে রশ্মি এসে লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে লেন্সের প্রধান ফোকসে এসে পড়ল। একটা ছোট প্রতিবিম্ব হল। এইবার চোখের কাছে যে-লেন্স রয়েছে তাকে একটু এদিক-ওদিক করে ওই প্রতিবিম্বকে স্পষ্ট করে দেখা হল, প্রতিবিম্ব বড়ও হল। ওতে কিন্তু প্রতিবিম্বটি বস্তুতঃ উল্টে যাবে। আকাশের

গ্রহনক্ষত্র উল্টালে ক্ষতি নেই। কিন্তু পৃথিবীর জিনিস উল্টো দেখালে তো চলবে না।

গ্যালিলিওর তৈরি দুরবীনে চোখের কাছের লেন্স উত্তল না হয়ে অবতল ছিল। এই রকম ব্যবস্থায় প্রতিবিম্ব সোজাই থাকে। বাইন-কুলার দিয়ে আমরা যে অল্প দূরের জিনিস দেখি, তাতে এই ধরণের দুটি দুরবীন দুচোখের সামনে থাকে।

বৃষ্টি হচ্ছে, উঠানে একটা খালি বোতল বসিয়ে রাখলুম, বোতলে জল জমা হতে থাকল। বোতলের মুখ সরু। সুতরাং জল ধীরে ধীরে বোতলের মধ্যে যেতে থাকল। কিন্তু বোতলের মুখে বড় ফাঁদওয়ালা একটা ফানেল যদি বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে ফানেলটা বেশি জল ধরে বোতলের মধ্যে পাঠাতে থাকবে। এখানে ফানেল যেমন জল ধরছে, দুরবীনের সামনের দিকের লেন্স সেই রকম আলো ধরে ভিতরে পাঠাচ্ছে। কাজে-কাজেই এই লেন্সের ফাঁদ যত বড় হবে, এ তত বেশি রশ্মি ধরে চোখে পাঠাবে। এর ফলে জিনিসটা উজ্জ্বল দেখাবে আর যে জিনিসকে খালি চোখে দেখা যাচ্ছিল না, এখন তার থেকে বেশি রশ্মি চোখে এসে পড়ায় সে আপনাকে স্পষ্টতর করে প্রকাশ করবে।

সুতরাং সামনের লেন্সকে বড় করবার দিকে বিজ্ঞানী মন দিলেন। নিউটন দেখলেন, লেন্সকে অনেক বড় করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আলো ধরবার জন্যে তিনি লেন্স ছেড়ে অবতল দর্পণ ব্যবহার করলেন। এই রকম দর্পণযুক্ত দুরবীন দিয়ে হার্শেল ইউরেনস গ্রহ আবিষ্কার করলেন। সে দর্পণের ব্যাস ছিল 48 ইঞ্চি। দর্পণ আরও-বড় করা হতে লাগল। আমেরিকার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে যে দুরবীন বসান হয়েছে তার ব্যাস হল 100 ইঞ্চি।

কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকায় মাউন্ট পালোমার মানমন্দিরে যে দুরবীনটি বসান হল তা 200 ইঞ্চি ব্যাসের, আর তা পৃথিবীর সকল দুরবীনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটা তৈরি এক আশ্চর্য ব্যাপার। 1934 সালে এর দর্পণের ঢালাই কাজ আরম্ভ হয়, আর অনেক দিন ধরে তা চলে। কাচের উপর একটা আস্তরণ দিয়ে দর্পণ তৈরি হয়। কাচকে 2800° ডিগ্রী

ফ্যারেনহিটে তোলা হয়, তিন সপ্তাহ ধরে সেই একই উষ্ণতায় রাখা হয়, তারপর খুব ধীরে ধীরে, রোজ 1·4 ডিগ্রী ফ্যারেনহিট হারে, উষ্ণতা কমান হয়। জিনিসটা না চিড় খায়, কোথাও একচুল উঁচু-নিচু না থেকে যায়, সেই জন্য এই রকম ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত দর্পণটার ওজন 25 টন, অথচ এমন ব্যবস্থা রাখতে হল যাতে যন্ত্রটিকে সহজে এদিক-ওদিক নাড়ান যায়। ঢালাই-এর পর ঘষার কাজ আরম্ভ হল। ঠিকমতো বক্রতা রাখবার জন্যে ওর থেকে চার টন কাচ ঘষে উঠিয়ে নিতে হবে, অথচ তলের বক্রতা ঠিক যে-রকম হবার কথা তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও এদিক ওদিক না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দুরূহ ব্যাপার! যা হোক এই দূরবীন তৈরির কাজ শেষ হল। গত যুদ্ধের জন্য অনেকটা দেরি পড়ে গিয়েছিল। চন্দ্র পৃথিবী থেকে 2 লক্ষ 39 হাজার মাইল দূরে রয়েছে। সেই চন্দ্র 25 মাইল দূরে থাকলে তাকে যে রকম দেখাত এই দূরবীন দিয়ে দেখলে সেই রকম দেখায়। এই যন্ত্র আকাশের কত যে বিস্ময় মানুষের চোখে ধরে দিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই!

সাদা আলোর নানা রঙে ভেঙে যাওয়া

জানলার খড়খড়ির সরু ফুটো দিয়ে সূর্যের আলো একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকল। সেই আলোর পথে নিউটন একটা প্রিজ্‌ম ধরলেন, দেওয়ালের উপর সাদা আলো না পড়ে পড়ল ভিন্ন ভিন্ন রঙের একটা পটি। তাই দেখে নিউটন ঠিক করলেন, সাদা আলো বিশুদ্ধ আলো নয়, ওই ভিন্ন ভিন্ন রং-এর রশ্মি মিশে সাদা আলো হয়েছে। সাদা আলো প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে যাওয়ায় এই যে বর্ণালি হল, নিউটন সেই বর্ণালিকে আর একটা প্রিজমের উপর ফেললেন, তবে এ প্রিজ্‌মটা উল্টো করে বসান। এবার নিউটন দেখলেন, এই বিভিন্ন রঙের বর্ণালি প্রিজমের মধ্য দিয়ে ওধারে গিয়ে মিলল, আর মিলে আগেকার সেই সাদা আলো হল। সাদা রং ভেঙে বিভিন্ন রং হল, আবার সেই সব রং মিশে সাদা রঙে দাঁড়াল।

কিন্তু সাদা রং ভেঙে যে নানা রকমের রং হল, সংখ্যায় এরা কত? অসংখ্য বললেই হয়, অভিধানে অত রঙের নাম নেই, থাকতে পারে না। বর্ণালিটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এক রং ধীরে ধীরে অল্প অল্প পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে অন্য রঙে দাঁড়াচ্ছে। তবে মোটামুটি আমরা

সাতটা রং দেখি, তারা হল—লাল, নারঙ্গ, হলদে, সবুজ, নীল, মহানীল ও বেগনি। নিউটন অন্য এক পরীক্ষায় দেখালেন যে, এই সাতটা রং মিলে সাদার অনুভূতি আনে। একখানা চাকতির মাঝখান থেকে কিনারা অবধি অনেকগুলি রেখা টানা হল, চাকতিটি অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হল। এইবার আগেকার ওই সাতটা রং দিয়ে চাকতির ভাগগুলি পর রঙিয়ে দেওয়া হল। এখন এই চাকতিটাকে জোরে ঘোরাতে থাকলে আমাদের চোখে ওই সব বিভিন্ন রঙের অনুভূতি হবে না, চাকতিটা সাদা বলে মনে হবে। তাড়াতাড়ি ঘোরবার ফলে বিভিন্ন রঙের অনুভূতি মস্তিক গিয়ে মিলে মিশে সাদা রঙের অনুভূতি জাগাবে।

আমরা আগে দেখেছি, আলোর রশ্মি যখন এক রকমের স্বচ্ছ পদার্থ থেকে আর এক রকমের স্বচ্ছ পদার্থে ঢোকে, তখন সে তার আগের পথে চলে না, তার থেকে একটু হেলে। এই হেলার পরিমাণ সব রঙের পক্ষে এক নয়, লাল সব চেয়ে কম বাঁকে, বেগনি বাঁকে সব চেয়ে বেশি। বায়ুর মধ্যে সব রং মিশে সাদা রং হয়ে ছুটছিল। কাচে ঢুকে যে যার আলাদা পথ নিল, কাজে-কাজেই রংগুলি আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

বর্ণালি-মাপক যন্ত্র

বিজ্ঞানী সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করল যাতে একটা রং কোথায় পড়েছে সঠিকভাবে মাপা যায়। আমরা যদি কেরোসিনের আলো, মোমবাতির আলো, বৈদ্যুতিক আলো ওই যন্ত্র দিয়ে দেখি তবে লাল থেকে বেগনি অবধি বিস্তৃত একটা বর্ণালি দেখব, পর পর রং চলে গিয়েছে, কোথাও একটুও ফাঁক নেই, ছেদ নেই। কিন্তু তামা, সোনা, হাইড্রোজেনের মতো কোন মৌলিক পদার্থ বেশি গরম করলে যে-আলো দেবে, সেই আলো ওই যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে ঠিক আগেকার মতো বর্ণালি দেখব না। তখন প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের জন্য দেখব কয়েকটি বিশিষ্ট রেখা, এক রঙের বা ভিন্ন ভিন্ন রঙের। ধরা যাক, সোডিয়ম বলে যে ধাতু আছে তার বাষ্প ওই যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করছি। দেখব দুটো খুব কাছাকাছি হলদে রঙের রেখা। এক একটা মৌলিক পদার্থ আনতে লাগলুম, আর প্রত্যেকটার জন্য কতটা রেখা কোন্ কোন্ জায়গায় হচ্ছে টুকে রাখলুম।

এইবার আমাদের একটা জিনিস দেওয়া হল, আর সেটা যে কি আমাদের জানা নেই, বলে দিতে হবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওটাকে বিশ্লেষণ না করেও আমরা বলে দিতে পারব। জিনিসটা খুব গরম করে ওর বর্ণালিতে কি কি রেখা কোথায় কোথায় হচ্ছে দেখলুম। এইবার আমাদের খাতায় দেখলুম কোন্ জিনিস ওই রকম রেখা দেয়, সুতরাং জিনিসটা কি আমরা নির্ভুলভাবে বলে দেব।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল।

মোমবাতির আলো, কেরোসিনের আলো, গ্যাসের আলো, বৈদ্যুতিক আলো সাদা, আর এই সব আলোর বর্ণালি লাল থেকে বেগনি অবধি বরাবর চলে গিয়েছে। সূর্যের আলোও সাদা, কিন্তু দেখা গেল সূর্যের বর্ণালিতে বহু সূক্ষ্ম কাল রেখা এক দিক থেকে অপর দিক অবধি নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। কেন এই রকম হয়?

আগের দুটো পরীক্ষার কথায় আসা যাক। সাদা আলো লাল থেকে বেগনি অবধি বিস্তৃত একটা বর্ণালি দেয়। অন্য পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সোডিয়ম বাষ্পের বর্ণালিতে আছে দুটো হলদে রঙের রেখা, আর কিছু নয়। এইবার তৃতীয় একটা পরীক্ষা হল। এতে উত্তপ্ত বস্তু থেকে সাদা আলো চলল অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তপ্ত সোডিয়ম বাষ্পের মধ্য দিয়ে। এখন দেখব, নানা রঙে রঞ্জিত একটি বর্ণালিতে দুটি কাল রেখা রয়েছে। কাল রেখাদুটি হয়েছে ঠিক সেই সেই জায়গায়, শুধু সোডিয়ম বাষ্পের জন্য যেখানে সেখানে হলদে রেখা হত।

তাহলে তো সূর্যের ওই কাল দাগগুলোর হদিস পাওয়া গেল। আমরা এই সিদ্ধান্তে এলুম যে, সূর্য খুব বেশি উষ্ণ একটি জ্বলন্ত পদার্থ, ওর থেকে সকল রঙের আলো ছুটল। কিন্তু সূর্যকে বেষ্টন করে রয়েছে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ কতকগুলি মৌলিক পদার্থের বাষ্প। এই সব বাষ্পের মধ্য দিয়ে যথম ভিতরকার সকল রঙের আলো চলে, তখন ওই ভিন্ন ভিন্ন বাষ্প যে যার রঙের আলো শুষে নেয়। তাই পৃথিবীতে সূর্যের যে-আলো এসে পৌছল, তাতে ঠিক ওই ওই রেখার অভাব হল, কাজে-কাজেই ওই সব জায়গায় কাল কাল রেখা দেখাদিল। এইভাবে বিজ্ঞানী তার যন্ত্র দিয়া নির্ভুলভাবে বলে দিল যে, ন কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে

যে সূর্য রয়েছে, সেই সূর্যের চারিদিকে ঘিরে আছে লোহা, হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতির বাষ্প।

শুধু কি তাই! বর্ণালি পরীক্ষা করে মানুষের জ্ঞান কত দিকে কত রকমের বেড়ে গেল। একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। 1868 সালে নরম্যান লকিআর সূর্যের আলোর বর্ণালিতে একটা রেখা দেখলেন, পরিচিত কোন পদার্থের রেখার সঙ্গে যার কোন মিল নেই। তবে তো সূর্যের মধ্যে একটা নূতন পদার্থের সন্ধান মিলল। এর নাম দেওয়া হল হিলিয়ম। এই রকম যায়। প্রায় 25 বছর পরে র‍্যামসে সর্বপ্রথম খনিজ পদার্থের মধ্যে আবদ্ধ ওই জিনিসটা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার! একটা জিনিসের প্রথম সন্ধান মিলল সূর্যে, তারপর তাকে পাওয়া গেল পৃথিবীতে।

মানুষের চিন্তা কত দিকে ছুটল। একটা নক্ষত্রের বর্ণালিতে একটা রেখা যেখানে হবার কথা, তার থেকে এধারে বা ওধারে কতটুকু সরে গেছে দেখে বিজ্ঞানী হিসেব করে বলল, ওই নক্ষত্র এতো বেগে পৃথিবীর দিকে আসছে, পৃথিবী থেকে সরে চলছে।

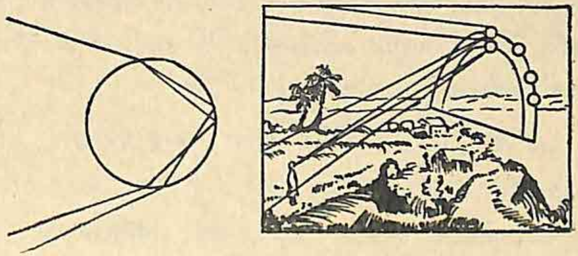
বর্ণালির বিভিন্ন অংশ

লাল থেকে বেগনি অবধি বিস্তৃত সমস্ত বর্ণালিটাব মধ্যে হলদে আলোর জোর সবচেয়ে বেশী। হলদের দু-দিকের আলোর জোর ক্রমশ কমে গিয়েছে। উত্তাপ সবচেয়ে বেশী লালে। আবার রাসায়নিক ক্রিয়ার জোর একেবারে অপর দিকে,—বেগনিতে। লালে রাসায়নিক ক্রিয়া সবচেয়ে কম, সেই কারণে ফটোগ্রাফির কাজকর্ম লাল আলো জেলে করা চলে।

রামধনু

সূর্য যখন ক্ষিতিজ থেকে খুব বেশী উপরে না থাকে, আর আকাশে অপর দিকে বৃষ্টি পড়তে থাকে, তখন সূর্যের দিকে পিছন ফিরে বৃষ্টির দিকে তাকালে রামধনু দেখা যায়। সকালে পূব দিকে যখন সূর্য থাকে তখন পশ্চিম দিকে বৃষ্টি হলে পশ্চিম আকাশে রামধনু দেখা যাবে,

আবার বিকালে পূব দিকে বৃষ্টি পড়তে থাকলে পশ্চিম থেকে সূর্যরশ্মি এসে পূব আকাশে রামধনু সৃষ্টি করবে।



চিত্র–25 রামধনু
বাঁ দিকের চিত্রে একটয় রশ্মি ঠিকটা জলের ফোঁটার ভিতর ঢুকে বেরিয়ে আসছে, প্রতিসরণে সাদা আলো ভেঙে যাচ্ছে, ডান দিকের চিত্রে বিভিন্ন জলবিন্দুর দরুণ বিভিন্ন রঙের রশ্মি চোখে পড়ে রামধনুর সৃষ্টি করেছে।

সূর্য থেকে যে সাদা রশ্মি আসছে, তা একটি জলের ফোঁটার মধ্যে ঢুকল। ঢুকে লাল থেকে বেগনি ভিন্ন ভিন্ন রঙের ভেঙে গেল। এখন ফোঁটার মধ্যে এই বিভিন্ন রঙের রশ্মিগুলির প্রতিফলন হল। প্রতিফলিত রশ্মিগুলির আবার প্রতিসরণ হল। তারা বাইরে এল, আর এক এক রশ্মি এক এক দিকে ছুটল। ভিন্ন ভিন্ন জলবিন্দু থেকে এই রকম হয়ে আকাশের গায়ে একটা রামধনুর সৃষ্টি হল। এই রামধনুর লাল আলো থাকে সব উপরে, বেগনি আলো সব নিচে।

যেদিক রামধনু দেখা যাচ্ছে, সেদিকে বেশি মেঘ না থাকলে একটা ছাড়া আরও একটা রামধনু দেখা যায়। জলের ফোঁটার ভিতর ডুবার প্রতিফলনে এই দ্বিতীয় রামধনুর সৃষ্টি হয়। প্রথমটার চেয়ে এই দ্বিতীয় রামধনু হবে একটু বেশী চওড়া, তবে প্রথমটার মতো অত উজ্জ্বল নয়, আর লালটা থাকবে সব নিচে, বেগনিটা সব উপরে।

রং

সাদা আলোর বর্ণালিতে যে ভিন্ন ভিন্ন রং দেখা যায়, সেগুলিকে বিশুদ্ধ রং বলা হয়। দুই বা তার বেশী বিশুদ্ধ রং মিশিয়ে নানা রঙের সৃষ্টি করা যায়। এই মিশ্রিত রং নতুন রকমের অনুভূতি দেয়।

যে-সব রং দিয়ে এই মিশ্রিত রং তৈরি হল, মিশ্রণের মধ্যে চোখ পৃথক-ভাবে তাদের আর খুঁজে পায় না।

দেখা যায়, দুটি বিশেষ রকমের রং মিশে অনেকটা সাদা আলোর অনুভূতি জাগায়, যেমন—নারঙ্গ ও নীল, হলদে ও মহানীল। অবশ্য সূর্যের আলোয় মতো সাদা হয় না।

প্রকৃতিতে যে ভিন্ন ভিন্ন রঙিন পদার্থ দেখা যায়, সে সব রঙের উৎপত্তি হয় অন্য রকমে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। লাল টক্‌টকে একটা জবাফুল দেখছি। ওই জবাফুলের একটা বিশেষ ধর্ম আছে। সে বেগনী, মহানীল, নীল, সবুজ, হলদে, নারঙ্গ এ-সব রং শুষে নেয়, ছেড়ে দেয় শুধু লাল। সূর্যের সাদা আলো ওই জবাফুলের উপর পড়ল, জবাফুল ওই সাদা আলোর মধ্যে লাল ছাড়া আর সব রংকে শুষে নিল, লালকে ছেড়ে দিল, ফুলটা লাল দেখাল। এই যে কথাটা বলা হল এইভাবে তার যাচাই হতে পারে: অন্ধকার ঘরে দেওয়ালের উপর একটা চওড়া বর্ণালি ফেলা হল। এই বর্ণালির ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ওই জবাফুলটি ধরলে দেখা যাবে যে, লালের মধ্যে রাখলে ওটা লাল, কিন্তু অন্য কোন রঙের মধ্যে আনলে ওটা একেবারে কাল দেখাচ্ছে। পরীক্ষাটা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। একটা অন্ধকার ঘর কেবলমাত্র সোডিয়ম বাষ্পের হলদে রং দিয়ে আলোকিত করা হল। এখন এই ঘরে যদি লাল জবাফুল আনা যায়, তবে তাকে কাল দেখাবে। কারণ এই, ঘরে একমাত্র হলদে রং আছে, জবাফুল এই হলদে রং শুষে নিল, কোন রং ছাড়ল না, কাজে-কাজেই ওটা কাল দেখাল। আর শুধু লাল জবাফুল নয়, ঘরের মধ্যে সবুজ নীল প্রভৃতি রঙের যে-কোন জিনিস আনা হোক, সব কাল দেখাবে। একমাত্র হলদে জিনিসই হলদে দেখাবে।

একখানা সাদা কাগজ বা যে-কোন সাদা জিনিস কোন রংই শুষে নেয় না, কাজে-কাজেই লাল রঙের মধ্যে ধরলে তদের লাল দেখায়, নীল রঙের মধ্যে নীল, যে-কোন রঙের মধ্যে ধরা যাক সেই রঙেরই দেখাবে।

কাল বলে কোন রং নেই, রং মাত্রেরই অভাব হল কাল।

প্রতিফলিত আলোতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দেখি। অবশ্য যারা নিজেরা আলো দেয় তাদের কথা আলাদা। যখন প্রতিফলন

হয় তখন পদার্থের কণাগুলি রং শুষে নেয়। শুধু উপরের কণারা নয়, ভিতরের কণারাও এ-কাজে যোগ দেয়। সেইজন্য অনেক সময় দেখা যায়, রঙিন জিনিসকে গুঁড়া করলে তাদের সাদা দেখায়। এখানে আলো পদার্থের ভিতরে ঢুকছে না, শুধু উপরে কণাগুলি থেকে প্রতিফলন হচ্ছে, আর তারা শুষছে অতি কম। তুঁতে, লাল কাচ গুঁড়ো করলে সাদাই দেখায়।

এইবার দেখা যাক, দুরকমের দুটি রঙিন জিনিস মেশালে তাদের কি রকম দেখাবে। ধরা যাক, হলদে ও নীল রঙের গুঁড়ো মেশান হল। ওই মেশান গুঁড়ো কি বকম দেখাবে ?

এখানে হলদে গুঁড়ো হলদে রং ছেড়ে দেবে, আর কিছু পরিমাণে দু-পাশের নারঙ্গ ও সবুজ ছাড়বে, অন্য সব রং শুষে নেবে। আর নীল রঙের গুঁড়ো নীল ছাড়বে, আর অল্প পরিমাণে ছাড়বে ওর দু-পাশের সবুজ ও মহানীল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুটোর মধ্যে একটা যা ছাড়ছে অন্যটা তা শুষে নিচ্ছে, শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছে সবুজের বেলায় সবুজকে দুটোই ছেড়ে দিচ্ছে। কাজে-কাজেই মেশান গুঁড়াকে সবুজ দেখাবে। অতএব দাঁড়াচ্ছে, নীল আলো ও হলদে আলো মেশান এক কথা, আর নীল রঙের ও হলদে রঙের গুঁড়া মেশান আর এক কথা।

আর একটা ব্যাপার আছে। লাল, সবুজ ও নীল এই তিন রকমের রং উপযুক্ত পরিমাণে মেশালে মোটামুটি যে-কোন রং পাওয়া যায়। সেই কারণে এই তিনটি রংকে প্রাথমিক রং বলা হয়।

প্রতিপ্রভা ও অনুপ্রভা

একটা পদার্থের উপর আলো এসে পড়ল। ওই পদার্থ কিছুটা আলো-শক্তি শুষে নিল, কিছুটা ছেড়ে দিল। যে অংশ শুষে নিল, তার বেশির ভাগ তাপ-শক্তির রূপ নেয়। কিন্তু যেটা ছাড়ল সেটার কথায় আসা যাক। কয়েকটা পদার্থ আছে, তারা বাইরে থেকে যে রং পেল সে রং নয়, তার বদলে অন্য রং ছাড়ে। এই ব্যাপারকে বলা হয় প্রতিপ্রভা।

বেরিয়ম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড একটা প্রতিপ্রভ জিনিস। বেগনি আলো এর উপর পড়ল, এ নীল আলো বিকিরণ করতে থাকল। আরও

আশ্চর্যের বিষয় এই, বেগনি আলোর পরবর্তী যে ঈথর-তরঙ্গ, যে ঈথর-তরঙ্গ চোখে দেখা যায় না, সেই অদৃশ্য ঈথর-তরঙ্গ এর উপর ফেললে এর থেকে ঈষৎ হলদে আলো বেরতে থাকে। তাই অদৃশ্য এক্স-রশ্মিকে দৃষ্টিগোচর করবার জন্যে এই বেরিয়ম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড-মাখান পর্দা ব্যবহার করা হয়।

আর একটা ব্যাপার আছে। কোন পদার্থের উপর আলো পড়ল, পদার্থ আলো ছাড়তে লাগল। আলো-ফেলা বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পদার্থও আলো ছাড়া বন্ধ করবে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আলো-ফেলা বন্ধ করবার পরও আলো-ছাড়া চলতে থাকে। এই ব্যাপারকে বলা হয় অনুপ্রভা। ক্যালসিয়ম সালফাইড বলে একটা রাসায়নিক দ্রব্য আছে, যাকে কিছু সময় রোদে রেখে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গেলে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তার থেকে আলো বেরতে থাকে। এই রকমের আরও কয়েকটা জিনিস আছে। এরা হল অনুপ্রভ পদার্থ। কয়েকটি পোকা-মাকড়ের এই রকমের অনুপ্রভা দেখা যায়। ডাঙায় জোনাকি-পোকার কথা আমরা সকলে জানি। কিন্তু সমুদ্রে বহু জীব আছে, যারা রাত্রে এই রকম জ্বলতে থাকে। সমুদ্র তখন কি অপূর্ব শোভা ধারণ করে !

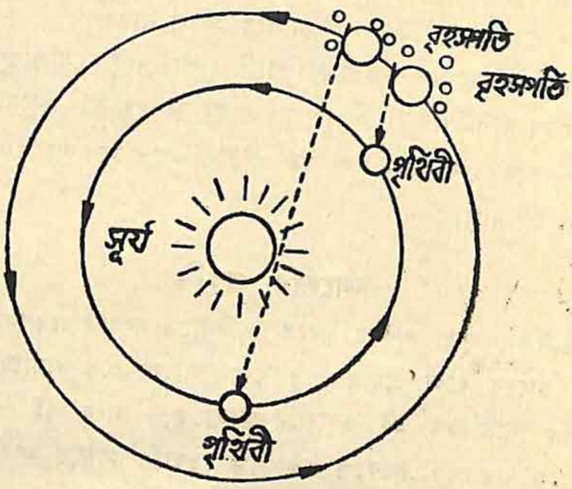
আলোর বেগ

আলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে কিছু সময় নেয়, না, যাওয়াটা তখনি তখনি ঘটে ?

সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলে চাইলুম, বাইরের জিনিস চোখে পড়ল। দেখলুম পূর্ব আকাশ লাল করে সূর্য উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্য সেই লোক, যে প্রথম বললে—আলো জ্বলল, আর তার কিছু পরে আমরা আলো দেখলুম; তখনি তখনি ব্যাপারটা ঘটল না, মাঝে কিছু সময় লাগছে। সময় লাগে, মানুষ এই ধারণা করল ; কিন্তু সে সময়টা কত অনেকদিন যাবৎ তা আর বেরল না। না বেরবার কারণ ছিল এই যে, সময়টা অত্যন্ত কম, মাপা শক্ত।

রোমার নামে একজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম আলোর বেগ মাপলেন। সূর্যের আলো পৃথিবীর গায়ে পড়ে যে-ছায়া ফেলে, তার মধ্যে চন্দ্র ঢুকলে

চন্দ্রগ্রহণ হয়। সেই রকম বৃহস্পতি যে-ছায়া ফেলছে, সেই ছায়ার মধ্যে বৃহস্পতির একটি চন্দ্র গেলে সেই চন্দ্রেরও গ্রহণ দেখা যাবে। এই চন্দ্রের



চিত্র—26
বৃহস্পতির চন্দ্রের গ্রহণ দেখে আলোর বেগ মাপা

গ্রহণ কতক্ষণ অন্তর অন্তর হবে রোমার তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখলেন প্রায় 42 ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওই গ্রহণ হয়। পৃথিবী ও বৃহস্পতি যখন সবচেয়ে কাছে, তখন কোন্ দিন কোন্ সময় ওই গ্রহণ হয় রোমার তা টুকে রাখলেন, আর কয়েক মাস পরে পৃথিবী ও বৃহস্পতি সবচেয়ে যখন দূরে থাকবে সেই সময় ঠিক কোন্ দিন কখন আবার গ্রহণ হবে রোমার তা হিসেব করলেন। সেদিন সেই সময় এল, কিন্তু রোমার গ্রহণ দেখতে পেলেন না। যখন হবার কথা তার 16 মিনিট পরে ওই গ্রহণ দেখলেন। রোমার সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিলম্ব হবার একমাত্র কারণ হল, আলোর একটা বেগ আছে, আর আলো সেই বেগে দৌড়ে 16 মিনিটে ওই অতিরিক্ত পথটা অতিক্রম করছে। ওই অতিরিক্ত পথ হল পৃথিবী থেকে সূর্য যতদূরে তার দুগুণ। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হল 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল। এর থেকে আলো এক সেকেণ্ডে কতটা পথ যায় তার হিসেব হল। দেখা গেল, আলো সেকেণ্ডে চলে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি

হাজার মাইল। এটা হল শূন্যস্থানে, বায়ুতেও ওই রকম ধরা যেতে পারে। কিন্তু অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থে এই বেগ কম।

বিজ্ঞানীর চেষ্টার অন্ত নেই। আকাশের জ্যোতিষ্ক দেখে নয়, পৃথিবীতে বসে আলো নিয়ে পরীক্ষা করে সে আলোর বেগ মাপবে। কিন্তু যা চলে এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সোজাসুজি ভাবে তো সে-বেগ মাপা যায় না, শব্দের বেগ যেমন মাপা যায়। অনেক কৌশল অবলম্বন করে সে এমন সব যন্ত্র খাটাল যাতে করে আরও সূক্ষ্ম ভাবে আলোর বেগ মাপা গেল।

আলোর প্রকৃতি

যে-সকল দূত বাইরে থেকে পৃথিবীতে সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে, আলো তাদের মধ্যে প্রধান। দূর থেকে আলো এসে আমাদের চোখের মধ্যে ঢুকে আমাদের এই কথাগুলি জানাচ্ছে,—আমি ওই দিক থেকে আসছি, আমার বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, আমি বের হবার পর আমার পিছনে কি কি ঘটেছে আমি জানিনে, তোমার চোখের পিছনকার পরদায় গিয়ে পৌঁছলেই আমার মৃত্যু।

আলোর জন্ম হল এক জায়গায়, মৃত্যু হল আর এক জায়গায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল বা অল্পকাল সে কি করে কাটাল! সূর্য থেকে যে-আলো বেরল, তা প্রায় আট মিনিট পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছল। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে ন' কোটি মাইলেরও বেশি পথ আলো কি করে অতিক্রম করল? সাধারণভাবে দেখা যাক, শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কি করে চালনা করা যায়। নদীতে একখানা নৌকা ভাসছে, পারে দাঁড়িয়ে আমি কি করে নৌকাকে নাড়া দিতে পারি? এক উপায়, একটা লাঠি দিয়ে নৌকাকে ঠেলা দেওয়া; আর এক উপায়, নৌকার গায়ে ঢিল ছোঁড়া; আর তৃতীয় উপায় হল জলে ঢেউ তোলা, সেই ঢেউ এগিয়ে চলে নৌকাকে নাড়াবে। এখানে প্রথম উপায়টি চলে না, রইল দ্বিতীয় বা তৃতীয়। নিউটন বললেন, জ্যোতিষ্মান বস্তু থেকে অনেকগুলি ছোট ছোট কণিকা বেরিয়ে চারদিকে ছুটছে, আর এই কণিকাদের মধ্যে কতকগুলি আমাদের চোখে ঢুকে আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি

জাগাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন সব ঘটনা দেখা গেল, যাতে নিউটনের এই কণিকাবাদ দাঁড়াল না। দেখা গেল, বিশেষ অবস্থায় দুটি আলোর রশ্মি আপনা-আপনি কাটাকাটি করে; দেখা গেল, আলোর রশ্মি বাঁকে যদিও খুব অল্প পরিমাণে। কণিকা চলছে ধরলে এ-সব ব্যাপারের মীমাংসা হয় না। এই বার ধরা গেল, আলো ঢেউ-এ চলেছে। প্রশ্ন উঠল, কিসের ঢেউ? পৃথিবীর উপর কিছু দূরে গিয়ে বায়ু শেষ হয়েছে, তারপর বিরাট শূন্যতা, তার মধ্যে দিয়েও আলো চলেছে। কাজেই এমন একটা জিনিস ভেবে নিতে হল, যা যাবতীয় পদার্থ ব্যেপে, সমস্ত শূন্যস্থান ব্যেপে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে রয়েছে। তার নাম দেওয়া হল ঈথর। এই ঈথর সম্বন্ধে এইটুকু ধরে নেওয়া হল যে, ও কাঁপে। এই অবধি, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা রইল না। অবশ্য আইনস্টাইন বললেন, যার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই, কি দরকার তাকে কল্পনা করবার! কিন্তু বলবার সুবিধা হবে বলে আমরা ঈথরের ঢেউই বললুম। সূর্য থেকে এই ঈথরের ঢেউ ছুটল, প্রতি-সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুটল। এর এক রকমের ঢেউ আমাদের লালের অনুভূতি দেবে, অন্য রকমের ঢেউ অন্য রঙের অনুভূতি জানাবে। সূর্য থেকে এই সব রকমের ঢেউ আসছে, সবাই মিলে সাদা আলোর অনুভূতি জাগাচ্ছে।

কিন্তু এই যে রকম-রকম ঢেউ, এদের পার্থক্যটা কোথায়?

ঢেউ-এর এক মাথা থেকে অন্য মাথার দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। ঈথরের যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির লক্ষ-ভাগের তিন-ভাগ, সে হল লাল আলো। আর যা লক্ষ-ভাগের দেড়-ভাগ, তা হল বেগনি আলো। যে জায়গার মধ্যে লাল আলোর একটা ঢেউ থাকবে, সেই জায়গায় থাকবে বেগনি আলোর দুটো ঢেউ।

দুশো বছর ধরে এই তরঙ্গবাদ চলল। প্রকৃতির জানা সব ঘটনা এই তত্ত্ব দিয়ে মীমাংসা করা গেল। তারপর এমন দু-একটা ঘটনা দেখা দিতে থাকল, যা আবার এ দিয়ে মেলান গেল না। বিজ্ঞানীকে তখন নতুন নতুন তত্ত্বের সন্ধানে ছুটতে হল। সে-সব কথা এখানে থাক।

যতই দিন যাচ্ছে, ততই মানুষ বিশ্ব সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞান, গভীর জ্ঞান লাভ করে চলেছে বটে, কিন্তু ততই সে বুঝছে তার না-জানাটা কত বেশি!

পদার্থবিদ্যা : দ্বিতীয় খণ্ড (৯)

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

